কমিশন বা সংস্থা যাতে তাদের সাংগঠনিক দায়িত্ব ঠিকমত পালন করে, তার দেখাশোনা করে কেন্দ্রীয় প্রশাসন।

● (৩) রাজ্য সরকারগুলিকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দান ঃ

শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার একা শিক্ষার উন্নতি সাধন করতে পারে না যদি রাজ্য সরকারগুলি ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি এ ব্যাপারে সাহায্য না করে। তাই কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষার ব্যাপারে রাজ্য সরকার এবং শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন সংগঠনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ, উপদেশ ও উৎসাহ প্রদান করে। তাছাড়া শিক্ষা যুগ্ম তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারেরও রাজ্য সরকারগুলির পাশাপাশি একটা দায়িত্ব থেকেই যাচ্ছে। শিক্ষা সংক্রান্ত কোন সমস্যা দেখা দিলে কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদের (CABE) মাধ্যমে তার সমাধান করার চেষ্টা করেন।

● (৪) আর্থিক অনুদান ঃ

শিক্ষার উন্নয়নমূলক কাজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের একটা অংশীদারিত্ব আছে। ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষানীতির কোন নতুন প্রকল্প চালু করতে হলে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের মাধ্যমে বিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে নানাভাবে আর্থিক সাহায্য করে থাকেন। এই সব প্রকল্পের অনুদান যাতে ঠিকভাবে ব্যবহৃত হয় তার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট নির্দিষ্ট সময় অন্তর হিসাব জমা দিতে হয় (utilisation cerfificate)।

● (৫) শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্য আনয়ন করা ঃ

কেন্দ্রীয় সরকারের একটি বড় দায়িত্ব হল শিক্ষাক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধার সব রকম বৈষম্য দূর করা। দেখা গেছে অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষেরা এতদিন শিক্ষার সমান সুযোগ লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। নানা কারণে তপশীলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের সন্তানেরা, পার্বত্য জাতির সন্তানেরা, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সন্তানেরা, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীরা এবং মেয়েরা শিক্ষার নানা প্রকার সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। তারা যাতে অন্যান্যদের মত শিক্ষার সমান সুযোগ লাভ করতে পারে, সেইজন্য কেন্দ্রীয় সরকার তাদের শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন ও নানাপ্রকার অনুদানের ব্যবস্থাও করেছেন। এইসব সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহার হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের কাছে নিয়মিতভাবে রিপোর্ট পাঠাতে হয়।

■ **কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা-সম্বন্ধীয় প্রশাসন (Educational Administration in the Central Government) ঃ**

কেন্দ্রীয় সরকারের একটি স্বতন্ত্র মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক (Ministry of Human Resource Development বা M.H.R.D.) আছে এবং এর জন্য একজন মন্ত্রীও আছেন। এর দুটি দপ্তর বা বিভাগ ; একটি হল শিক্ষা দপ্তর এবং অন্যটি হল সাংস্কৃতিক বা কৃষ্টি-দপ্তর (Department of Culture)। মন্ত্রকটির দায়িত্বে থাকেন একজন মন্ত্রী। মন্ত্রকের অধীনে একটি সচিবালয় (Secretariate) এবং একটি অধিকর্তাদের দপ্তর

■ M.H.R.D.-র দায়িত্ব ও কার্যাবলী (Responsibilities and Functions of M.H.R.D.) :

সারা দেশের জন্য একটা সুসমন্বিত শিক্ষা বিস্তার করার উদ্দেশ্যে এবং ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশ মত শিক্ষা মন্ত্রককে বিশেষ জাতীয় ভূমিকা পালন করতে হয়। শিক্ষার উন্নতিকল্পে বিস্তারিত পরিকল্পনা করা এবং সেই পরিকল্পনা বিভিন্ন দপ্তর ও সহযোগী সংস্থাগুলির মাধ্যমে রূপায়িত হচ্ছে কিনা — তা দেখা শিক্ষা মন্ত্রকেরই দায়িত্ব। শিক্ষা বর্তমানে যুগ্ম তালিকাভুক্ত হলেও কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে —

➢ (১) যে সমস্ত কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় আছে এবং লোকসভা কর্তৃক ঘোষিত যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সম্পূর্ণ বা আংশিক আর্থিক অনুদান প্রাপ্ত হয়, সেগুলির প্রশাসন ও পরিচালনার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীয় সরকারের (List I, Entries 63, 64)।

➢ (২) পেশা বা বৃত্তিগত এবং প্রযুক্তি বা কারিগরী প্রশিক্ষণ (technical training) দেয় এমন সব কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান (List I, Entry 65) এবং বিশেষ ধরনের শিক্ষা ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান।

➢ (৩) গবেষণামূলক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উচ্চতর শিক্ষা দেয় এমন সমস্ত কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়ন এবং সমন্বয় সাধন (List I, Entry 66)।

➢ (৪) হিন্দী ভাষার উন্নয়ন ও বিস্তার (সংবিধানের ৩৫১ নং ধারা)।

➢ (৫) রাজ্য সরকারগুলি ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য যে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রারম্ভিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে, তার ব্যয় নির্বাহের জন্য অনুদান ও তত্ত্বাবধান করা (রাজ্যের নির্দেশাত্মক নীতি, ধারা ৪৫)।

➢ (৬) দুর্বল (অর্থনৈতিক ভাবে) ও অনগ্রসর সম্প্রদায়, তপশীলি জাতি ও উপজাতি, সংখ্যালঘু, পশ্চাৎপদ প্রভৃতি শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সমান সুযোগ দানের জন্য বিশেষ জাতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা (৪৬নং ধারা)।

শিক্ষার দ্বিতীয় তালিকার ২০ নং অন্তর্ভুক্তি (Entry-20) অনুযায়ী শিক্ষাক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা ও তার দায়ভার গ্রহণ করা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির যৌথ দায়িত্ব। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের একটা 'অর্থপূর্ণ অংশীদারিত্ব' থেকে গেছে। তাছাড়া সংবিধানের ২৮২ নং ধারাতে কেন্দ্রীয় সরকারকে জনস্বার্থে কোন প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক অনুদান দেওয়ার ক্ষমতা ও স্বাধীনতা দুই-ই দেওয়া হয়েছে (কেবল লোকসভা যে ক্ষেত্রে আইন প্রবর্তন করতে পারেন, সেগুলি ছাড়া)।

এগুলি ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আরও কিছু কাজের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার জন্য বাধ্য। এগুলি হল —

➢ (১) কোন বিদেশের সরকার ভারতীয় ছাত্রকে অথবা ভারত সরকার কোন বিদেশী ছাত্রকে গবেষণা বা উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রদান করলে (Scholarship) সে সম্বন্ধে

...নীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং তা কার্যকরী করা। M.H.R.D. দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে ...ী মৌলিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে। এই মন্ত্রক কেবল উচ্চ শিক্ষা, বিজ্ঞান ...শিক্ষা বা কারিগরী শিক্ষার উন্নতি সাধনই করে না, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ...সারের ব্যাপারেও অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে।

➤ (২) যোগ্য ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের ভারতবর্ষে বা বিদেশে উচ্চ শিক্ষা বা গবেষণার ...বৃত্তি প্রদান করা।

➤ (৩) যুবকদের দেশের পক্ষে কল্যাণকর ও সেবামূলক কাজ এবং ক্রীড়ার ব্যবস্থা ...।

➤ (৪) কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে তার তত্ত্বাবধান ...ছাড়াও রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসকদের শিক্ষা-পরিকল্পনা ও শিক্ষা ...ন্ত কর্মসূচী রূপায়ণে পরামর্শ দেওয়া ও সাহায্য করা।

➤ (৫) সাধারণভাবে শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে রাজ্য সরকারগুলিকে পরামর্শ দেওয়া।

➤ (৬) সমগ্র দেশের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্য বিভিন্ন বিভাগ ও দপ্তরের মধ্যে ...য় সাধন।

➤ (৭) প্রাচীন ও ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধ এবং পুঁথি, প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান, ...তাত্ত্বিক ভগ্নাবশেষ প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণ করা।

শিক্ষাক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়ক সংস্থা (Statutory/Autonomous Organisations of Central Government)

শিক্ষাক্ষেত্রে সংবিধান সংক্রান্ত, উপদেষ্টামূলক বা অন্যান্য কাজকর্মে সহায়তা করার ...ন্য কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় জাতীয় সরকার কতকগুলি বিধিবদ্ধ বা স্ব-শাসিত সংস্থা গঠন ...রেছেন। এগুলির আর্থিক দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত; কিন্তু ...দৈনিন কাজকর্মের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব সংস্থাগুলির উপরই অর্পিত এবং ...গুলি স্থাপিত হওয়ার সময় আইন দ্বারা বিধিবদ্ধকৃত। কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তর এই সমস্ত ...তিষ্ঠান বা সংস্থার প্রধান নির্বাচন, তাঁকে তাঁর পদে সমর্থন করা বা পদ থেকে চ্যুত ...করতে পারেন। আবার সংস্থাতে এক বা একাধিক সদস্য মনোনীত করতে পারেন। এই ...রীয় বহু সংস্থা আছে, কিন্তু শিক্ষাগত পরিকল্পনা ও শিক্ষাগত প্রশাসনের পক্ষে অত্যন্ত ...গুরুত্বপূর্ণ যে সব সংস্থার কথা বর্তমানে আমাদের আলোচনার বিষয়, সেগুলি হল —

■ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (University Grants Commission or UGC) :

১৯৪৪ সালে সার্জেন্ট কমিশনের রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী তৎকালীন ভারত ...র ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ট কমিটি প্রতিষ্ঠা করেন। তখন মাত্র চার জন

6

সদস্য নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয় এবং ঐ কমিটি কেবলমাত্র কেন্দ্র পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্যই নিয়োগ করা হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রথম শিক্ষা কমিশন অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণণ কমিশন ব্রিটেনের যাঁচে 'ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশন' প্রতিষ্ঠা করার সুপারিশ করেন। সেই উদ্দেশ্যে ১৯৫৬ সালে এতদসংক্রান্ত একটি আইনের বলে 'বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন' বা University Grants Commission (U.G.C.) প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে কিভাবে সাহায্য করা যায়, সে সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারকে উপদেশ দেওয়া। এর কার্যালয় দিল্লীতে অবস্থিত হলেও কাজের সীমা বিস্তৃত হওয়ার জন্য এর ছয়টি আঞ্চলিক অফিস স্থাপন করা হয়েছে — পুণা, ভুপাল, কলকাতা, হায়দ্রাবাদ, গৌহাটি ও ব্যাঙ্গালুরুতে।

➤ U.G.C.-র গঠন (Constitution of U.G.C.) :

U.G.C. প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৩ সালের ২৮শে ডিসেম্বর। তখন এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয় — বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন, শিক্ষার মানোন্নয়ন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিভিন্ন জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া এবং সেগুলির সমস্যার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে পরামর্শ দেওয়া এই সংস্থাটির প্রধান উদ্দেশ্য। অর্থাৎ U.G.C. কেন্দ্রীয় সরকারের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করবে। এছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়কে আর্থিক অনুদান, নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সম্প্রসারণের ব্যাপারে সিদ্ধান্তের কথাও সরকারকে জানাবে। এরপর ১৯৫৫ সালে লোকসভাতে একটি U.G.C. বিষয়ক বিল পেশ করা হয়। ১৯৫৬ সালে বিলটি পাশ হয় এবং তখন থেকে U.G.C. আইনানুগ একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এই আইনের বলে কমিশনে কতজন সদস্য থাকবেন তা স্থির করা হয় এইভাবে —

- মোট সদস্য হবে ৯ জন।
- এই ৯ জনের মধ্যে কমপক্ষে তিনজন হবেন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।
- কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি থাকবেন দু-জন।
- বাকী চারজন হবেন নামকরা শিক্ষাবিদ।

এই আইনে U.G.C.-কে কতকগুলি ক্ষমতা দেওয়া হয়, যেমন —

- বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য অর্থের বিলি-বণ্টন।
- কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে কত অর্থের প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে খোঁজ নেওয়া।
- স্নাতকোত্তর শিক্ষা এবং গবেষণামূলক কাজে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করা।
- বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উন্নয়নের কোন পরিকল্পনা থাকলে তা রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ১৯৬৬ সালে U.G.C. আইনের কিছু পরিবর্তন সাধন করা হয় এবং এর সদস্য সংখ্যা ৯ থেকে বাড়িয়ে ১২ করা হয়। বর্তমানে একজন পূর্ণ সময়ের

চেয়ারম্যান এবং একজন পূর্ণ সময়ের ভাইস-চেয়ারম্যান নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রত্যেক সদস্যের মেয়াদ ছয় বছরের।

➤ U.G.C.-র বিভিন্ন বিভাগ (Departments of U.G.C.) :

বর্তমানে U.G.C. এবং C.S.I.R. সম্মিলিতভাবে NET-এর সংগঠন করে থাকে। ২০০৯ সাল থেকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগের ক্ষেত্রে NET বাধ্যতামূলক। সেইজন্য এখন NET-এর গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। U.G.C.-র কতকগুলি বিভাগ আছে। সেগুলি C.S.I.R.-এর সঙ্গে পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে। এইসব বিভাগ হল —

➤ (১) কলা ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগ।

➤ (২) বিজ্ঞান ও কারিগরী বিভাগ।

➤ (৩) কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণকারী বিভাগ।

➤ (৪) সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজ এবং স্কলারশিপ ও ফেলোশিপ প্রদানকারী বিভাগ।

➤ (৫) মহাবিদ্যালয় পরিসংখ্যান, প্রকাশন এবং তথ্য সম্বন্ধীয় বিভাগ।

➤ (৬) গ্রীষ্মকালীন পাঠ্যক্রম, বেতন ইত্যাদি সম্বন্ধীয় বিভাগ।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মান্যতা প্রদানের বিষয়ে U.G.C.-কে সহায়তা করার জন্য কয়েকটি স্বশাসিত সংস্থা রয়েছে। এগুলি হল —

▶ (১) All India Council of Technical Education (AICTE)

▶ (২) Distance Education Bureau (DEB)

▶ (৩) National Council for Teacher Education (NCTE)

▶ (৪) Indian Council of Agricultural Research (ICAR)

▶ (৫) Bar Council of India (BCI)

▶ (৬) Medical Council of India (MCI)

▶ (৭) Pharmasist Council of India (PCI)

▶ (৮) Indian Nursing Council (INC)

▶ (৯) Rehabilitation Council of India (RCI)

▶ (১০) Dental Council of India (DCI)

▶ (১১) Central Council of India (CCI)

▶ (১২) Central Council of Indian Medicine (CCIM) প্রভৃতি।

M.H.R.D. ২০০৯ সালে U.G.C. এবং A.I.C.T.E.-র পরিবর্তে একটি উচ্চ ক্ষমতা বিশিষ্ট সংগঠন প্রতিষ্ঠা করার জন্য Higher Education and Research Bill পেশ করেন। এই বিলে U.G.C-র পরিবর্তে 'National Commission for Higher Education and Research' নামটি প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু U.G.C নামটি ঐতিহ্যবাহী

বলে ওটিই থেকে গেছে। U.G.C-র একটি শিক্ষক-শিক্ষণ কমিটি আছে। এর সদস্য সংখ্যা ৭ জন এবং প্রত্যেকের কার্যকাল ২ বছরের। এই কমিটির কাজ হল শিক্ষায় গবেষণার ব্যবস্থা, উৎসাহ দান এবং নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করা। অবশ্য এই কাজের জন্য জাতীয় বৃত্তি প্রদান এবং অন্যান্য দেশের শিক্ষণ-শিক্ষণ ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থাও আছে। এছাড়া কিছু পরিদর্শক অধ্যাপক নিয়োগ করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপন ও ভাবনা-চিন্তা বিনিময়ের ব্যবস্থাও করা হয়।

➤ U. G. C.-র কার্যাবলী (Functions of U.G.C.) :

U.G.C. প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যই ছিল উচ্চশিক্ষা, বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার পরিমাণগত এবং গুণগত মান উন্নয়ন করা। ভারতের বিশাল জনসংখ্যার জন্য উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা নিঃসন্দেহে এক কঠিন কাজ। এই কাজ করার জন্য U.G.C.-কে বিভিন্ন দিকে বিভিন্নভাবে কাজ করতে হয়। U.G.C.-কে যে সমস্ত ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়, সেগুলি হল —

- ➤ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে তাদের পরিকাঠামো বজায় রাখতে পারে, তারজন্য অনুদান দেওয়া।
- ➤ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নতুন পরিকাঠামো বা সম্প্রসারণের জন্য অনুদান দেওয়া।
- ➤ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সমস্যা অনুসন্ধান করা এবং প্রয়োজনীয় অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা করা।
- ➤ কোন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বিশেষধর্মী কাজের জন্য অনুদান দেওয়া।
- ➤ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারের উন্নয়নের জন্য অনুদান দেওয়া।
- ➤ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষাগারের রক্ষণাবেক্ষণ, নতুন যন্ত্রপাতি ক্রয় ইত্যাদির জন্য অর্থ মঞ্জুর করা।
- ➤ রাজ্যে নতুন কোন বিশ্ববিদ্যালয় হলে তাকে পাঁচ বছরের জন্য অনুদান দেওয়া।
- ➤ কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন কোন বিভাগ শুরু করার জন্য পাঁচ বছর অনুদান দেওয়া।
- ➤ দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা এবং বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে দেশের জন্য নতুন ব্যবস্থা বা কোন পরিবর্তনের জন্য সুপারিশ করা।
- ➤ গবেষণা ও পঠন-পাঠনের উন্নতির জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করা।
- ➤ শিক্ষকদের ফেলোশিপ এবং অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের কাজে লাগিয়ে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করা।

ভারতের মত বিশাল দেশে বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর জন্য আরও অনেক বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা প্রয়োজন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে বেশ কয়েকটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে এবং আরও কয়েকটি স্থাপিত হওয়ার কথা চলছে। কিন্তু

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ালেই চলবে না, পরিমাণগত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গুণগত উৎকর্ষ সাধন করতে হবে। তা না হলে সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

➤ U.G.C. যে যে কাজ করেছে (Activities done by U.G.C.) :

গঠিত হওয়ার পর খুব অল্প সময়ের মধ্যে U.G.C. বেশ কিছু পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণ করেছে। উল্লেখযোগ্য কাজগুলির কয়েকটি হল —

➤ (১) বেশ কিছু উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে স্ব-শাসনের অনুমোদন দান (Autonomous Colleges)।

➤ (২) প্রাক্ স্নাতক স্তরের শিক্ষার পুনর্গঠন এবং শিক্ষাকে কর্ম, বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রভৃতে কলমে করার মাধ্যমে আরও প্রাসঙ্গিক ও বাস্তব করে তোলা।

➤ (৩) বিশ্ববিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়গুলির বিভিন্ন বিভাগকে সুসংগঠিত, ঐক্যবদ্ধ ও সম্প্রসারিত করা।

➤ (৪) প্রায় একশোর মত বিশ্ববিদ্যালয়কে কম্পিউটার এবং দুইশতর কাছাকাছি কলেজকে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যে মিনি-কম্পিউটার প্রদান।

➤ (৫) বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে নবনিযুক্ত অধ্যাপকদের অভিমুখীকরণ (orientation) প্রশিক্ষণের জন্য কিছু Academic Staff College স্থাপন।

➤ (৬) শিক্ষকদের ব্যক্তিগত গবেষণা ও কলেজে গবেষণায় উৎসাহ দানের জন্য বিশেষ সহায়তা ও আর্থিক অনুদান।

➤ (৭) JNU-তে নিউক্লিয়ার সায়েন্স কেন্দ্র, পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ে Radio Astronomy Centre এবং হায়দ্রাবাদে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে National Centre of Astronomy প্রতিষ্ঠা করা।

➤ (৮) শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তি বিজ্ঞানকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করার জন্য উৎসাহ দান। এর জন্য সপ্তম পরিকল্পনার সময়কালে U.G.C. ২০০০ নির্বাচিত মহাবিদ্যালয়কে রঙিন TV. দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। এছাড়া বর্তমানে U.G.C. বহু বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে Educational Media Research Centre (EMRC) স্থাপনের পরিকল্পনা করেছেন।

➤ (৯) U.G.C. ৯২টি বিশ্ববিদ্যালয় ও ২১২১টি কলেজে বয়স্ক শিক্ষা, ধারাবাহিক শিক্ষা এবং সম্প্রসারিত কর্মসূচীর (Extension Programme) ব্যবস্থা করেছেন।

➤ (১০) তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ সুবিধা দানের ব্যবস্থা।

➤ (১১) কলেজ শিক্ষকদের এক কলেজ থেকে অন্য কলেজে সাময়িক বিনিময়ের (Bi-lateral Exchange Programme) কর্মসূচী তৈরী করা।

➤ (১২) বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যাতে নারী-শিক্ষার ব্যাপারে উন্নত ধরনের গবেষণা ও প্রকল্প তৈরী করে এবং সেগুলি রূপায়ণের ব্যবস্থা করে, তারজন্য বিশেষ সহায়তা দান।

➤ (১৩) কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্বাচিত করে সেখানে Centre for Advanced Studies or CAS) স্থাপন করা এবং কতকগুলি নির্বাচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগকে বিশেষ আর্থিক সহায়তা দান।

■ জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ (National Council of Educational Research and Training or NCERT) ঃ

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৬১-৬৬) সময় শিক্ষামূলক কার্যের বিভিন্ন দিকে গবেষণা ও প্রশিক্ষণে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে জাতীয় স্তরে একটি স্ব-শাসিত সংস্থা প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। এর ফলেই ১৯৬১ সালে Society Registration Act (XXI Statute of 1860) অনুসারে এই সংস্থাটির উদ্ভব হয় ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর।

এই সংস্থাটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থায় M.H.R.D.-কে সাহায্য করা ও পরামর্শ দেওয়া যাতে নতুন পরিকল্পনা ও কর্মসূচী গ্রহণ করে বিদ্যালয় শিক্ষাকে আরও উন্নত করা যায়। এর আগে দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য All India Council for Secondary Education গঠিত হয়েছিল ১৯৫৫ সালে। তারপর ১৯৫৫ সালেই Directorate of Extensive Programme for Secondary Education (DEPSE) নামে আরও একটি বিভাগ গঠিত হয়েছিল। তাছাড়াও National Institute of Basic Education (১৯৫৬), National Fundamental Education Centre (১৯৫৬) এবং National Institute of Audio-Visual Education (১৯৫৯) গঠিত হলেও বিদ্যালয় শিক্ষার মান উন্নয়নে কোন সংস্থাই তেমন কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। বিদ্যালয় শিক্ষা সম্বন্ধীয় গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা হিসাবে এবং অন্যান্য দিকে N.C.E.R.T.-র ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না।

➤ N.C.E.R.T. গঠনের উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives of Formation of N.C.E.R.T.) ঃ

প্রধানত সারা ভারতবর্ষে সাধারণ শিক্ষার মান উন্নয়ন করাই এই সংস্থাটি গঠনের উদ্দেশ্য ছিল। এ ছাড়া আরও যে সমস্ত উদ্দেশ্যের কথা চিন্তা করা হয়েছিল সেগুলি হল এইরূপ —

- ➤ বিদ্যালয় শিক্ষা ও শিক্ষক-শিক্ষণ বিষয়ে গবেষণা করা এবং তার ফল বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা।
- ➤ শিক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা ও মানব সম্পদ উন্নয়নে তা প্রয়োগ করা।
- ➤ সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত দেশের বিদ্যালয় শিক্ষার অবস্থা পর্যালোচনা করে সেগুলির সঙ্গে ভারতবর্ষের বিদ্যালয় শিক্ষার মানের সাদৃশ্য ঘটানো।
- ➤ বিদ্যালয় শিক্ষা সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে M.H.R.D.-কে প্রদান করে তার সহায়তা করা।

● (৩) দিল্লীতে অবস্থিত Central Institute of Educational Technology।

● (৪) ভূপালে অবস্থিত Pandit Sundarlal Sharma Central Institute of Vocational Education।

● (৫) প্রতিটি রাজ্যের State Institutes of Educational Research and Training (SCERT)।

➤ **উপসমিতি (Sub-Committees) :**

NCERT-র পরিচালক সমিতি ৬টি উপসমিতির মাধ্যমে কার্যাবলী সম্পাদন করে। এগুলি হল —

➢ (১) অর্থ সম্বন্ধীয় উপ-সমিতি (Finance Sub-Committee)

➢ (২) ব্যবস্থাপক উপ-সমিতি (Establishment Sub-Committee)

➢ (৩) গবেষণামূলক উপ-সমিতি (Educational Research Sub-Committee)

➢ (৪) গৃহনির্মাণ সংক্রান্ত উপ-সমিতি (Building Sub-Committee)

➢ (৫) কর্মসূচী উপদেষ্টা উপ-সমিতি (Programme Advisory Sub-Committee)

➢ (৬) আঞ্চলিক শিক্ষা মহাবিদ্যালয় সম্বন্ধীয় উপ-সমিতি (Regional College of Education Sub-Committee)।

ভারতে পাঁচটি Regional College of Education (RCE) আছে এবং এগুলি বিদ্যালয় সংক্রান্ত উন্নয়নমূলক কাজে সহায়তা করে, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয় এবং বিদ্যালয় সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণামূলক কার্য সম্পাদন করে। এছাড়া NCERT ১৭টি রাজ্যে অফিস স্থাপন করেছে। এই অফিসগুলি রাজ্যগুলিকে বিদ্যালয় সংক্রান্ত বিষয়ে সাহায্য ও পরামর্শ দিয়ে থাকে।

➤ **NCERT-র বিভিন্ন কর্মসূচী (Various Programmes of NCERT) :**

NCERT তার সহযোগী সংস্থা National Institute of Education এবং তার বিভিন্ন বিভাগ থেকে জাতীয় শিক্ষার অগ্রগতি, বিদ্যালয় শিক্ষার অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে এবং প্রতি পাঁচ বছর পর পর একটি সমীক্ষা জাতীয় স্তরে প্রকাশ করে (All India Education Survey)। এই সমীক্ষার রিপোর্ট থেকে সরকার যেমন শিক্ষার অবস্থা বুঝে নিতে পারে, তেমনই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষক, শিক্ষক প্রমুখও শিক্ষার অবস্থা, অগ্রগতি ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পেরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। এখন NCERT-র প্রধান প্রধান কর্মসূচীগুলি নীচে উল্লেখ করা হল —

➢ শিক্ষকদের কর্মরত অবস্থায় প্রশিক্ষণ গ্রহণের সমস্যা, শিক্ষা পরিকল্পনা প্রস্তুত করার ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানগত সমস্যা এবং বিভিন্ন রাজ্যস্থিত শিক্ষা সংস্থাগুলির প্রশাসনিক সমস্যা সম্পর্কে অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহ করা।

➢ বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বিভিন্ন বিষয়ে উত্তম শিক্ষাদানের জন্য চার্ট, মডেল, ফিল্ম স্ট্রিপ ইত্যাদি জাতীয় শিক্ষোপকরণ প্রস্তুত করা।

➢ বুনিয়াদী শিক্ষার সমস্যাগুলি অনুসন্ধান করা এবং বয়স্ক শিক্ষার জন্য কর্মসূচী প্রণয়ন করা।

➢ বিশেষজ্ঞ কমিটির সাহায্যে সারা দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম, বিশেষত গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ের পাঠ্যক্রমের পর্যালোচনা করে নতুন করে পাঠ্যক্রম রচনা করা ও একই সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষণ-প্রণালী উন্নততর করার চেষ্টা করা এবং বিভিন্ন রাজ্যের সরকারকে তা মেনে চলার নির্দেশ দান করা।

➢ মনোবিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষণ-শিখন বিষয় নিয়ে গবেষণা করা এবং সেই গবেষণালব্ধ ফল ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্রয়োগ করে বিদ্যালয় শিক্ষার মান উন্নত করার চেষ্টা করা।

➢ শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও NCERT করে থাকে। উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে ৪ বছরের এবং স্নাতকোত্তর স্তরের পর ১ বছরের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

➢ বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সহায়তায় NCERT বিভিন্ন স্তরের পাঠ্যক্রমের উপর ভিত্তি করে পাঠ্যপুস্তক রচনা করে এবং সেগুলি বিভিন্ন রাজ্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে ব্যবহার করা হয়।

➢ N.C.E.R.T. শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতি প্রস্তুত করে এবং রাজ্যগুলিকে এই সম্বন্ধে নির্দেশগুলি মেনে চলতে বলা হয়।

➢ সমাজবিদ্যার (Social Studies) পরিধি বিস্তৃত করা এবং এই বিষয়টি ভালভাবে শিক্ষাদানের প্রযুক্তিগত কৌশল আবিষ্কার করা।

➢ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নানা প্রকার নির্মাণমূলক বা গঠনমূলক কাজে কিভাবে অর্থের অপচয় বন্ধ করা যায়, সে সম্বন্ধে উপায় আবিষ্কার করা।

➢ বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষামূলক গবেষণা চালানোর জন্য উৎসাহ দান ও প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করা।

➢ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য-কল্যাণ বিভাগের (Health and Welfare Department) সহায়তা ও সহযোগিতায় গবেষণা কার্য পরিচালনা করা।

➢ সমাজ বিজ্ঞান ও মানব বিজ্ঞানের পাঠ্যক্রম ও শিক্ষাদান পদ্ধতির উন্নতির জন্য 'গ্রীষ্মকালীন কেন্দ্র' (Summer Institutes) স্থাপন করা এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করা।

➢ বিভিন্ন রাজ্যের আঞ্চলিক শিক্ষা মহাবিদ্যালয়গুলিতে (Regional College of Education or RCE) কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য গ্রীষ্মকালীন কেন্দ্র ও ডাকযোগে শিক্ষার (Correspondence Programme) ব্যবস্থা করা।

➢ বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষকদের জন্য U.G.C. এবং U.S.A.I.D. (The United States Agency for International Development)-র সহায়তায় গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্পে বিশেষ জাতীয় প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করা।

➤ শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিভিন্ন পত্রিকা, জার্নাল, নির্দেশিকা ও বুলেটিন প্রকাশ করা এবং সেগুলি যেন যথেষ্ট উচ্চমানের হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

➤ NCERT জাতীয় মেধা অন্বেষণ (National Talent Search), জওহরলাল জাতীয় বিজ্ঞান প্রদর্শনী ইত্যাদির আয়োজনও করে থাকে।

NCERT-র প্রধান উদ্দেশ্য যদিও বিদ্যালয় শিক্ষার মানোন্নয়ন করা, তবুও এই প্রতিষ্ঠানটি দেশের সকল স্তরের শিক্ষার মান উন্নয়নে পরোক্ষভাবে সাহায্য করে থাকে।

■ জাতীয় মূল্যায়ন এবং স্বীকৃতিদান পর্ষদ (National Assessment and Accreditation Council – NAAC) :

এই পরিষদ বা পর্ষদটি খুব সম্প্রতি গঠিত হয়েছে। ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতির সুপারিশ মত ১৯৯৪ সালে NAAC গঠিত হয়। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার মানের অবনমন রোধ করাই এর প্রধান উদ্দেশ্য। এটি একটি স্ব-শাসিত সংস্থা এবং ব্যাঙ্গালোরে এর প্রধান কার্যালয়। এই পর্ষদকে U.G.C.-র অধীনে কাজ করার জন্য প্রস্তুত করা হয়। এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান — অর্থাৎ কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিষ্ঠানগুলির মূল্যায়ন করা এবং তাদের কৃতিত্ব স্বীকৃত করা বা কতটা কৃতিত্ব তা স্বীকার করে নেওয়া। এই পর্ষদকে স্বীকৃতি দিয়েছে U.G.C. এবং এটি একটি স্ব-শাসিত সংস্থা হিসাবে বিশেষজ্ঞ দল নিয়ে বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে তথ্য সংগ্রহ করার পর প্রতিষ্ঠানগুলির মূল্যায়ন করে সেগুলির মান নির্ধারণ করে — A, B, C ও D এই চার রকম পর্যায়ে।

➤ NAAC-এর গঠন (Structure of NAAC) :

এর কমিটিতে U.G.C.-র চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে সদস্য, যদিও NAAC-এর একজন সভাপতি বা চেয়ার পার্সন আছেন। NAAC-এর দুটি বিভাগ — General Council (G.C) ও Executive Council (E.C)। এছাড়া চারটি কমিটি আছে, যথা — উপদেষ্টা কমিটি (Advisory Committee), পরামর্শমূলক কমিটি (Consultative Committee), কেন্দ্রীয় কর্মী (Core Staff) এবং পরামর্শদাতা (Consultant)। U.G.C.-র চেয়ারম্যান ও NAAC-এর চেয়ার পার্সন, E.C.-র সদস্য। NAAC-এর চেয়ার পার্সনকে সম্পাদকের (Secretary) কাজ করতে হয়।

➤ NAAC-এর লক্ষ্য (Aims or Vision of NAAC) :

ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষাকে কিভাবে উন্নতমানে উপনীত করা যায় সে সম্বন্ধে পথনির্দেশ করাই NAAC-এর লক্ষ্য। বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যেভাবে পঠন-পাঠন হয় তা কতটা উচ্চমানের, তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য NAAC-এর নির্বাচিত বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিরা বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন, মূল্যায়ন করেন এবং কিভাবে শিক্ষার মান উন্নততর করা যায়, সে বিষয়ে উপদেশ দান করেন। এর লক্ষ্য হিসাবে বলা হয়েছে

পাঠ্যক্রম চালু তো করবেই, তাছাড়া M.A/M.Sc (Education) কোর্স প্রবর্তন করবে। তাছাড়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স-এর ব্যবস্থাও করতে পারে। তাছাড়া উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য উপযুক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন অধ্যাপকও নিয়োগ করতে পারবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় NCTE প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক — সব স্তরের শিক্ষক-শিক্ষণের পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন সাধন করেছিল। প্রাক্-প্রাথমিক ও এলিমেন্টারি বা প্রারম্ভিক (I to VIII) স্তরের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের সময়কাল হবে দু-বছরের এবং এর পরিচালনা করবে DIET-এর মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। NCTE নির্দেশিত মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষণ-প্রশিক্ষণের পাঠ্যক্রমটি হবে ১ বছরের। এর মধ্যে থাকবে সাধারণ B.Ed (Elementary) এবং বিশেষ B.Ed (Special)। ভার্মা কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে এই পাঠ্যক্রমটি হবে ২ বছরের। এছাড়া থাকবে —

- উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক-প্রশিক্ষণ
- স্নাতক পরবর্তী স্তরের M.Ed.
- পাঠ্যবিষয় অনুসারে বিশেষধর্মী B.Ed.
- স্বাস্থ্যশিক্ষা সম্পর্কিত B.P.Ed এবং M.P.Ed.।

NCTE শিক্ষক-শিক্ষণের নতুন পাঠ্যক্রমও প্রস্তুত করেছে। প্রকৃতপক্ষে NCTE সারা ভারতে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষত শিক্ষক-শিক্ষণ ক্ষেত্রে একটি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে — এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

রাজ্য স্তরে শিক্ষা সহায়ক সংস্থা (State Agencies of Education)

■ স্টেট কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ এণ্ড ট্রেনিং (State Council of Educational Research and Training or S.C.E.R.T.) ঃ

শিক্ষার উন্নয়ন ও গুণগত মান বৃদ্ধির ব্যাপারে কেন্দ্রীয় স্তরে NCERT যে ভূমিকা পালন করে, রাজ্যস্তরে সেই ভূমিকা পালন করে SCERT। সাধারণভাবে বিদ্যালয় শিক্ষার গুণগত মানের উৎকর্ষ সাধন করার জন্য ভারত সরকার বিভিন্ন রাজ্যে State Institute of Education (SIE) স্থাপন করার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। প্রথম দিকে কয়েকটি রাজ্যে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান কাজ শুরু করলেও পরবর্তীকালে প্রতি রাজ্যের জেলাতে জেলাতে, এমনকি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলেও এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে এর

পাশাপাশি কিছু রাজ্য অন্য কতকগুলি বিশেষ জাতীয় শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানও চালু করে। ফলে বহু সংখ্যক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও সংযোগ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এর ফলে শিক্ষামন্ত্রক ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে এই সকল কেন্দ্র, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাগুলিকে একত্রে সমন্বিত করে মাত্র একটি নির্দিষ্ট সংস্থায় রূপান্তরিত করার সুপারিশ করেন। এই সংস্থার নামকরণ করা হয় State Council of Educational Research and Training, সংক্ষেপে SCERT। আসলে পূর্বেকার State Institute of Education গুলিকেই SCERT-তে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল এর কয়েক বছর পূর্ব থেকেই। অন্ধ্রপ্রদেশ ১৯৬৭ সালেই SCERT প্রতিষ্ঠা করে। কতকগুলি রাজ্যে SIE-কে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করে SCERT-তে রূপান্তরিত করা হয় এবং তাদের উপর বেশি করে দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব অর্পণ করা হয়।

SCERT একটি স্ব-শাসিত সংস্থা। NCERT যেমন কেন্দ্রীয় সংস্থা, SCERT তার অনুরূপ একটি রাজ্যস্তরের সংস্থা এবং উভয়ের ক্ষমতা ও কার্যপ্রণালী একই প্রকার। সংস্থার প্রধানকে বলা হয় নির্দেশক (Director)। এর একটি পরিচালন সমিতি আছে এবং তার প্রধান বা চেয়ারম্যান হলেন রাজ্যের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী। রাজ্যের বিদ্যালয়গুলির জন্য পরিকল্পনা তৈরী করা, সেগুলি বাস্তবে রূপায়িত করা এবং বিদ্যালয়গুলির মূল্যায়নের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব এই সংস্থার উপর ন্যস্ত। তাছাড়া বিদ্যালয়ের পক্ষে উপযুক্ত পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করা, পাঠ্যপুস্তক রচনা করা, শিক্ষকদের কর্মরত অবস্থায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং শিক্ষামূলক গবেষণা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও এই সংস্থাটির বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

➤ SCERT-র সংগঠন (Organisation of SCERT) :

SCERT-র সাংগঠনিক রূপটি এই রকম — রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী এই পর্ষদের সভাপতি; এছাড়া অন্যান্য সদস্যরা হলেন শিক্ষা-আধিকারিক, কারিগরী শিক্ষা আধিকারিক, রাজ্য সরকার কর্তৃক মনোনীত বিভিন্ন প্রতিনিধিবৃন্দ। SCERT-র প্রশাসনিক কাঠামোকে নিম্নলিখিত পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন — (১) পর্ষদের প্রধান কর্মকর্তার দপ্তর, (২) পাঠ্যক্রম উন্নয়ন বিভাগ, (৩) শিক্ষা গবেষণা, মূল্যায়ন ও পরীক্ষা সংস্কার বিভাগ, (৪) শিক্ষণ ও সম্প্রসারণ বিভাগ, এবং (৫) শিক্ষা-প্রযুক্তি বিভাগ।

➤ SCERT-র বিভিন্ন বিভাগ (Departments of SCERT) :

ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে SCERT-র ভিন্ন ভিন্ন কাঠামো থাকলেও নিম্নলিখিত বিভাগগুলি সাধারণত প্রত্যেক SCERT-তে থাকে —

- (১) প্রাক্-বিদ্যালয় ও প্রারম্ভিক শিক্ষাবিভাগ,
- (২) প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষা বিভাগ,
- (৩) শিক্ষামূলক গবেষণা বিভাগ,
- (৪) বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষা বিভাগ,

কোন্ শর্ত পূরণ করলে বিদ্যালয় অনুদান পেতে পারে, সে সম্বন্ধে নিয়ম-কানুন পর্ষ
রচনা করে এবং বিদ্যালয়ের আর্থিক অনুদান মঞ্জুর করা যায় কি না তা রাজ্য সরকারে
সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জানায়।

➢ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি পর্ষদের কাজকর্ম সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা কর
এবং পর্ষদ কর্তৃক যে সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, সেগুলি কার্যকরী করার ব্যাপারে
দায়বদ্ধ থাকেন।

➤ **পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of WBBSE) :**

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। সেগুলি হল —

- বিদ্যালয়গুলির অনুমোদন দানে কোন পক্ষপাতিত্ব বা স্বেচ্ছাচারিতা থাকে না।
- পরীক্ষা গ্রহণ, ফলপ্রকাশ, মার্কশিট প্রদান ও শংসাপত্রদান নিয়মিতভাবেই হয়।
- পাঠ্যক্রম ও সিলেবাসের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও আধুনিকীকরণ করা হয়।
- রাজনৈতিক কারণে কোন বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতি বাতিল করা হয় না।
- রাজ্যব্যাপী শিক্ষকদের শিক্ষা-শিবিরের আয়োজন করে তাদের অভিমুখীকরণের সাহায্যে পঠন-পাঠনের মানোন্নয়ন করা হয়।
- শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের কর্ম-নিরাপত্তা যেমন সুনিশ্চিত করা হয়, তেমনই শৃঙ্খলাভঙ্গ বা দায়িত্বজ্ঞানহীনদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণও করা হয়।

■ পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ (West Bengal Council of Higher Secondary Education or W.B.C.H.S.E)

কোঠারী কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে দশ শ্রেণীর মাধ্যমিক স্তরের পরিবর্তে (কিছু কিছু স্কুলে একাদশ শ্রেণীও ছিল) বারো শ্রেণীর উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা প্রচলিত হল। প্রথম দিকে দশ-এগারো-বারো তিনটি শ্রেণীর স্কুল নিয়ে একটু গোলমাল থাকলেও পরে শিক্ষা ব্যবস্থা ১০ + ২ + ৩ + ২ স্তরে গিয়ে স্থির হল। দশ শ্রেণীর শিক্ষার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য যেমন পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ রয়েছে, তেমনই বারো শ্রেণীর শিক্ষা পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের জন্য পৃথক একটি স্ব-শাসিত সংস্থা সরকার কর্তৃক গঠিত হল এবং সেই সংস্থাটি হল পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ।

➤ **পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সদস্যবৃন্দ (Members of West Bengal Council of Higher Secondary Education) :**

প্রথম গঠিত হওয়ার সময় নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে সংস্থাটি গঠিত হয় — (১) সভাপতি, (২) পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি (পদাধিকার বলে), (৩) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মধ্যশিক্ষা অধিকর্তা (পদাধিকার বলে), (৪) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কারিগরী শিক্ষা অধিকর্তা (পদাধিকার বলে), (৫) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প অধিকর্তা (পদাধিকার বলে), (৬) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি অধিকর্তা (পদাধিকার বলে), (৭) রাজ্য সরকার কর্তৃক মনোনীত অনধিক ৭ জন সদস্য যার মধ্যে থাকবেন — (ক) একজন শিক্ষানুরাগী মহিলা, (খ) কোন কলেজের একজন অধ্যক্ষ, (গ) বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন ফ্যাকাল্টির একজন ডীন, (৮) একজন প্রধান শিক্ষক সহ মোট ৪ জন নির্বাচিত শিক্ষক, (৯) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি, (১০) বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিনিধি, এবং (১১) উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিনিধি। এছাড়া উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে রাজ্য সরকার কর্তৃক মনোনীত আরও ৫ জন সদস্য থাকবেন। সংসদের সভাপতি বেতনভোগী পূর্ণ সময়ের অফিসার হিসাবে বিবেচিত হবেন। তাঁর অধীনে সেক্রেটারী, সহকারী সেক্রেটারী, ডেপুটি সেক্রেটারী প্রভৃতি পদস্থ আধিকারিকেরা থাকবেন।

➤ **শাখা ও কমিটি :**

সংসদে নিম্নলিখিত শাখাগুলির জন্য একটি করে বোর্ড অফ্ স্টাডিজ গঠন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। শাখাগুলি হল — মানববিদ্যা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কৃষি, কারিগরী বিদ্যা, অন্যান্য বৃত্তিমূলক বিষয়। এছাড়া রাজ্য সরকার অনুমোদন দিলে নিম্নরূপ কমিটি সংসদ গঠন করতে পারবেন — অনুমোদন দান কমিটি (Recognition Committee), সিলেবাস কমিটি (Syllabus Committee), পরীক্ষা কমিটি (Examination Committee), অর্থ সম্বন্ধীয় কমিটি (Finance Committee), আবেদন কমিটি (Appeal Committee), অন্যান্য কমিটি।

➤ **উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের কার্যাবলী (Functions of WBCHSE) :**

উচ্চশিক্ষা (মাধ্যমিক) সম্বন্ধীয় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সংসদকে সম্পাদন করতে হয়। প্রধান প্রধান কাজগুলি হল —

● (১) রাজ্য সরকার উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপারে কোন প্রকার পরামর্শ চাইলে ঐ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দান করা সংসদের কাজ।

● (২) রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত আইন অনুযায়ী উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাকে পরিচালিত করা, তার তত্ত্বাবধান করা এবং তা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা সংসদের থাকবে। এই ক্ষমতার বলে সংসদ নিম্নরূপ কাজগুলি করতে পারবে —

2.1

➢ (ক) উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবর্তন করার জন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন দেওয়া, অনুমোদন না দেওয়া কিংবা পূর্বে অনুমোদিত কোন প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন বাতিল করা।

➢ (খ) অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুমোদন সংক্রান্ত সার্কুলার দেওয়া ও তাদের তালিকা প্রস্তুত করা।

➢ (গ) মাঝে মাঝে অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানগুলি পরিদর্শন করা।

➢ (ঘ) উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রম এবং সিলেবাস তৈরী করা, বিভিন্ন শাখাতে কোন্ কোন্ বিষয় পড়ানো হবে, তা স্থির করা।

➢ (ঙ) বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনা করা এবং পর্ষদের বাইরে লিখিত পুস্তকের অনুমোদন দেওয়া।

➢ (চ) বিভিন্ন বিষয়ে অনুমোদিত পুস্তকের তালিকা প্রকাশ করা।

➢ (ছ) যথাসময়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা, পরীক্ষক নিয়োগ করা, ফল প্রকাশ করা এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন রচনা করা।

➢ (জ) পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর সফল পরীক্ষার্থীদের ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট, পুরস্কার ও বৃত্তি প্রদান করা।

➢ (ঝ) প্রশ্নপত্র রচয়িতা, পরীক্ষক এবং পরীক্ষা সম্বন্ধীয় বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত কর্মীদের পারিশ্রমিক প্রদান।

➢ (ঞ) শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশান করা এবং পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি দান বা প্রত্যাখ্যান করা।

➢ (ট) সংসদের আর্থিক আয়-ব্যয় অনুযায়ী বাজেট প্রস্তুত করা।

➢ (ঠ) শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের কোন গুরুতর অভিযোগ থাকলে তাদের সুবিচারের সুযোগ দেওয়া এবং তার প্রতিকার করা।

➢ (ড) সংসদের সমস্ত কর্মচারীর জন্য শৃঙ্খলা রক্ষা সংক্রান্ত আচরণবিধি প্রস্তুত করা এবং সকলে যেন তা মেনে চলে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা।

● (৩) সংসদ যে সমস্ত নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করবে, সেগুলি রাজ্য সরকার দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে। সংসদের নিয়ম-কানুনগুলি অফিসিয়াল গেজেটের আকারে প্রকাশ করতে হবে।

● (৪) সংসদের নিয়ম-কানুনগুলি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জানিয়ে দিতে হবে।

● (৫) সংসদের সভাপতি সংসদের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা এবং সংসদ বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, সেগুলি কার্যকরী করার ব্যাপারে দায়বদ্ধ থাকবেন। তিনি রাজ্য সরকারের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করবেন। এছাড়াও সংসদের সভাপতির এক্তিয়ারভুক্ত কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা থাকবে। 22

■ পশ্চিমবঙ্গ উচ্চতর শিক্ষা পর্ষদ (West Bengal State Council of Higher Education or WBSCHE) :

কেন্দ্রে উচ্চ ও উচ্চতর এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার দেখাশোনার দায়িত্বে আছেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বা UGC। কিন্তু এই কমিশনের পক্ষে সমস্ত রাজ্যের উচ্চতর শিক্ষা বা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার তদারকী করা একটু কষ্টসাধ্য। তাই ১৯৮৮ সালে UGC প্রতিটি রাজ্যে উচ্চতর ও উচ্চতম শিক্ষার দেখাশোনা করার জন্য একটি পর্ষদ গঠনের সুপারিশ করেন। সেই সুপারিশ অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে উচ্চতর শিক্ষার পরিকল্পনা ও সমন্বয় সাধন করার জন্য ১৯৯৪ সালের ২৯শে জুলাই 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পর্ষদ (উচ্চতর শিক্ষা)' [WBSCHE] নামে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৯৯৪ সালের XXXVII অর্থাৎ ৩৭তম Act অনুসারে কমিশনটি গঠিত হয় এবং ১৯৯৫ সালের এপ্রিল মাস থেকে কার্যভার গ্রহণ করে। এই কমিশনের কার্যালয়ের ঠিকানা হল ১৪৭-এ রাসবিহারী অ্যাভেনিউ, কলকাতা-৭০০০২৯। কিছুদিন কমিশনটি কাজ করার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ২০১৫ সালের Act X অনুসারে কমিশনটি পুনর্গঠিত হয়। এই কমিশনের চেয়ারম্যান হলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং সম্পাদক হলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চতর শিক্ষা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও জৈব রসায়ন বিভাগের অতিরিক্ত প্রধান সম্পাদক ডঃ রাজেন্দ্র শুক্লা মহাশয় (IAS)। এছাড়া কমিটিতে একজন সহ-সভাপতি, মেম্বার সেক্রেটারী, জয়েন্ট সেক্রেটারী ও অন্যান্য সদস্যও আছেন।

উচ্চতর শিক্ষা অর্থাৎ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়ন ও পরিদর্শন করে উন্নয়নের পথ নির্দেশ করাই এই কমিশনের প্রধান কাজ। কমিশন কর্তৃক নির্বাচিত টিম রাজ্যে অবস্থিত বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করে কমিশনের নিকট রিপোর্ট পেশ করেন। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে কমিশন তার সুপারিশ শিক্ষা মন্ত্রকের নিকট জমা দেন। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নিজেই এই কমিশনের সভাপতি হওয়ার ফলে সুপারিশগুলি কার্যকরী হতে দেরী হয় না। তাছাড়া রাজ্যের কোন জেলা থেকে কোন অঞ্চলে নতুন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব এলে বা কমিশন কোন জেলাতে নতুন কোন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলে তা স্থাপন করতে পারেন। কমিশনের সদিচ্ছা আছে যে প্রতি জেলাতে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় হোক এবং মহিলাদের জন্য পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হোক। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য দক্ষিণ ২৪ পরগণার ডায়মণ্ডহারবারে (সরিষাতে) প্রথম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কৃতিত্ব এই কমিশনের। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেই কমিশনের কাজ সমাপ্ত হয় না। উপাচার্য ও শিক্ষক নিয়োগ, সিলেবাস তৈরী করা এবং উন্নততর পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করাও কমিশনের লক্ষ্য। রাজ্য সরকারও এই ব্যাপারে উদারভাবে সহযোগিতা করে চলেছেন। কোন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়

নতুন কোন বিষয়ে পঠন-পাঠন শুরু করতে চাইলে কমিশন সেই প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। কমিশনের অনুমোদন না পাওয়া গেলে নতুন কোন বিষয় বা শাখা চালু করা সম্ভব নয়।

কমিশন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা ও শিক্ষক সংখ্যার আনুপাতিক হার স্থির করার জন্য মোট ছাত্র ভর্তির হার (Gross Enrolment Ratio বা GER) এবং ছাত্র শিক্ষক অনুপাত (Pupil-Teacher Ratio বা PTR) বিচার করেন এবং কোন বৈসাদৃশ্য বা অসামঞ্জস্য দেখলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। তাছাড়া ভর্তির ব্যাপারে ছাত্র এবং ছাত্রীদের মধ্যে কোনরকম পার্থক্য অর্থাৎ 'Gender wise Information'-ও কমিশন সংগ্রহ করেন। বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নানা প্রকার তথ্য অনুসন্ধান করে (Statistical Information) কমিশন তা বিচার করে দেখেন।

শিক্ষক-শিক্ষণ সম্বন্ধে কমিশন খুব সতর্ক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। যে সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ নিজেদের টাকাতে কলেজ চালান (Self-financing College), তাদের শিক্ষার্থী সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেওয়া, উপযুক্ত ও যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করা, উপযুক্ত পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করা এবং প্রতি শিক্ষার্থীর নিকট ভর্তি ফী বাবদ কত টাকা নেওয়া হবে — তা স্থির করে দেন। এছাড়া সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী এবং Self-financing শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজগুলির সুষ্ঠু সমন্বয়নের জন্য একটি পৃথক শিক্ষক-শিক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয় (Teachers' Training University) স্থাপনের সুপারিশ করেন এবং কলকাতার বালিগঞ্জে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজে নিয়মমত পড়াশোনা ও অন্যান্য কাজ চলছে কিনা — তা নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করার ব্যবস্থা করেছেন কমিশন। মোট কথা কমিশন উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নের ব্যাপারে কোন প্রকার আপোষ করতে রাজী নন। তাই মাঝে মাঝে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও কলেজের অধ্যক্ষদের সঙ্গে কমিশনের সদস্যেরা আলোচনা করেন এবং তাদের বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ ও অসুবিধার কথা শুনে সেগুলি দূরীকরণের চেষ্টা করেন।

■ **জেলা শিক্ষা ও শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (District Institute of Education and Training or DIET) :**

স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষে শিক্ষার দুটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক হল — প্রারম্ভিক শিক্ষা সর্বজনীন করা এবং বয়স্ক শিক্ষা। ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দের জাতীয় শিক্ষানীতিতেও এই দুটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং তা সফল করার জন্য জেলা স্তরে একটি সংগঠন তৈরী করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। সেই উদ্দেশ্য অনুসারে জেলা স্তরে একটি করে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়, যার নাম দেওয়া হয় District Institute of Education and Training বা সংক্ষেপে DIET। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রারম্ভিক শিক্ষাক্ষেত্রে নিযুক্ত শিক্ষকদের নিয়োগের পূর্বে এবং কর্মরত অবস্থায় (Pre-Service এবং In-Service)

চতুর্থত, সমস্ত ঘটনা জানার পর এবং কোথায় কোথায় আর্থিক অপচয় ঘটতে পারে তা জানার পর কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এমনভাবে চিন্তাভাবনা করে পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন যাতে শিক্ষাখাতে অর্থের অপচয় বন্ধ হয়ে যায় এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যয় হ্রাস কর্তৃপক্ষ বা কলেজ কর্তৃপক্ষ না করেন। এইভাবে বস্তুসম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শিক্ষাজগতে একটা বিশাল অপচয় বন্ধ করা সম্ভব।

তবে এই ব্যবস্থাপনা একটি যৌথ উদ্যোগ। এর পরিকল্পনার পশ্চাতে বিদ্যালয় প্রশাসন, পরিদর্শক, তত্ত্বাবধায়ক সকলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এখন সেগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে মানবশক্তি ও বস্তুসম্পদের ব্যবস্থাপনা একান্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করি। অর্থাৎ শিক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত আছেন যে সমস্ত ব্যক্তি তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করে তাদের কর্মক্ষমতা এবং প্রাপ্ত বস্তুসম্পদের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে বুঝে থাকি। এরপর এই ব্যবস্থাপনার পশ্চাতে বিভিন্ন ব্যক্তি ও উপাদানের ভূমিকা কি তা বিচার করে দেখা যাক। প্রথমে দেখা যাক বিদ্যালয় প্রশাসকদের ভূমিকা কি? যে সমস্ত কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয়ের প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করেন তাদের মধ্যে আছেন কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, রাজ্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ, রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, বিদ্যালয় পরিচালক সমিতি প্রভৃতি। এইসব শিক্ষা কর্তৃপক্ষ কোন না কোন প্রকারে বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে। আগে প্রশাসন বলতে মনে করা হত পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট কতকগুলি নিয়মকানুন রচনা করা এবং অধস্তন কর্মীদের সেই সমস্ত নিয়মকানুন মেনে চলতে বাধ্য করা। এক্ষেত্রে প্রশাসনিক ক্ষমতা বিশেষ একটি স্থানে কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকত। কিন্তু বর্তমানে প্রশাসনিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। এখন কর্তৃপক্ষ শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি ব্যক্তিকে কিছু দায়িত্ব দিয়ে থাকেন এবং সেই দায়িত্ব যাতে তারা ঠিকমত পালন করে তাও লক্ষ্য করেন। তাছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে যে সমস্ত বস্তুসম্পদ থাকে, সেগুলি যাতে ঠিকমত ব্যবহৃত হয় সে বিষয়েও সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। সুতরাং বলা যায় শিক্ষাক্ষেত্রে যারা কর্তৃপক্ষ স্থানীয় ব্যক্তি, তারা এই ব্যাপারে একটা ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। এর ফলে শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

এরপর দেখা যাক, ব্যবস্থাপনার সঙ্গে তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শনের ভূমিকা কি? বিদ্যালয় পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের ধারণারও ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। পূর্বে তত্ত্বাবধায়ক এবং পরিদর্শকেরা বিদ্যালয়ের কাজকর্ম ঠিকমত চলছে কিনা, বিদ্যালয় গৃহ ও আসবাবপত্র এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখেই নিজেদের কাজ শেষ করতেন। কিন্তু বিদ্যালয়ে মানবশক্তি ও বস্তুসম্পদের সঠিক সদ্ব্যবহার হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে কোন খোঁজ খবর নিতেন না। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার নীতি গৃহীত হওয়ার ফলে তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শনের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত ব্যক্তির ভূমিকা পর্যবেক্ষণ

25

... এবং সকলকে সঠিক পথে পরিচালিত করে শিক্ষার মানের উৎকর্ষ সাধন ... চেষ্টা করা হয়।

... দেখা যাক, বস্তুগত ব্যবস্থাপনার সঙ্গে শিক্ষাগত অর্থসংস্থানের সম্পর্ক কি? ... জন্য বিভিন্ন প্রকার বস্তুসম্পদের প্রয়োজন হয় এবং প্রাপ্ত বস্তুসম্পদকে ঠিকমত ... লাগাতে হয়। তাছাড়া বিভিন্ন বস্তুসম্পদ থেকে বিদ্যালয় অর্থ সংগ্রহও করতে ... সাধারণত দেখা যায়, উপযুক্ত পরিকল্পনা বা ব্যবস্থাপনার অভাবে বিদ্যালয় ... অর্থ সংগ্রহ করতে পারছে না বা বস্তুসম্পদকে ঠিকমত কাজে লাগাতে ... না। তাছাড়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থের অপচয়ও লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু ব্যবস্থাপনার ... পদ্ধতি অনুসরণ করে ঐ সব ত্রুটি সংশোধন করা সম্ভব হয়েছে।

... দেখা যাক, মানবশক্তি ও বস্তুসম্পদের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে শিক্ষাগত ... সম্পর্কটি কি? কোন পরিকল্পনা না থাকলে মানবশক্তি ও বস্তুসম্পদের ... হতে বাধ্য। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষাগত পরিকল্পনা এই দুই ধরনের সম্পদের সঠিক ... ব্যবহার করার উপায় নির্দেশ করে এবং শিক্ষাকে তার সঠিক লক্ষ্যে ... একটা সঠিক পথ নির্দেশ করে। শিক্ষাগত পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনার একটি প্রধান ... আবার ব্যবস্থাপনার সঙ্গে মানবশক্তি ও বস্তুসম্পদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। তাই ... মানবশক্তি ও বস্তুসম্পদের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে শিক্ষাগত পরিকল্পনার একটা ... যোগসূত্র রয়েছে।

■ব্যবস্থাপনার মৌলিক ক্রিয়াকলাপ (Basic Functions of Management) :

... এলিয়ট এবং তার সহকর্মীদের মতে যে কোন প্রকার লক্ষ্য পূরণের জন্য ... অপরিহার্য। ব্যবস্থাপনার মৌলিক কাজকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা ... – পরিকল্পনা প্রণয়ন (Planning), যোগাযোগ রক্ষা করা (Communicating) ... নিয়ন্ত্রণ (Control)। পরিকল্পনা প্রণয়নের সাহায্যে লক্ষ্য এবং কর্মপদ্ধতি স্থির করা ... যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে হয় কথাবার্তা কিংবা সংবাদ আদান-প্রদানের মাধ্যমে ... রক্ষা করা হয়। নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে পরিকল্পনার সঙ্গে কর্মসম্পাদনের সঙ্গতি ... করা হয়।

... দেখা যাক, ব্যবস্থাপনার এই মৌলিক কাজগুলি কিভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে সম্পাদিত ... প্রথমেই ধরা যাক, **পরিকল্পনা প্রণয়নের** ব্যাপারটি। শিক্ষাগত ব্যবস্থাপনার প্রথম ... কাজ হল সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন। শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর থেকে সর্বনিম্ন স্তর ... এই পরিকল্পনা আবশ্যিক। এই পরিকল্পনা রচনা করার সময় দুটি বিষয়ের উপর ... আরোপ করা হয়। একটি হল, যে স্তরের জন্য পরিকল্পনা করা হচ্ছে, সেই স্তরের ... যে সমস্ত শিক্ষা সংক্রান্ত কাজকর্ম আছে, সেগুলির লক্ষ্য স্থির করা এবং ঐ লক্ষ্য ... করার জন্য কিরকম কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত তা নির্ধারণ করা। এই লক্ষ্যে

উপনীত হতে গেলে যে সমস্ত সম্পদের প্রয়োজন, সেগুলিকে সুসংগঠিত ও সদ্ব্যবহার যে পদ্ধতিতে করা সম্ভব তাকেই পরিকল্পনা বলা হয়। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তার কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য ব্যবস্থাপনার কৌশল প্রয়োগ করে। কিন্তু এই কৌশল প্রয়োগ করতে হলে ঐ কাজকর্মের লক্ষ্য আগের থেকে স্থির করে নিতে হবে। আসলে লক্ষ্য জানা থাকলে তবেই লক্ষ্য পূরণ করার জন্য কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে তা স্থির করা যায়। সুতরাং বলা যায়, পরিকল্পনা প্রণয়নের অর্থ হল লক্ষ্য ও পদ্ধতির মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপন করা। যখনই এই দুটি কাজ সম্পন্ন করা হয় তখনই পরিকল্পনা প্রণয়ন হয়েছে বলা যায়।

এরপর আসে **যোগাযোগ রক্ষার** প্রশ্ন। প্রতিষ্ঠানের পরিচালকেরা চাইবেন লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য যে কর্মপদ্ধতি স্থির করা হয়েছে তা যেন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা ঠিকমত অনুসরণ করেন। এই ব্যাপারে পরিচালকবৃন্দ তাঁদের মতামত ও ব্যবস্থাপনা স্পষ্টভাবে সমস্ত কর্মীকে জানাবেন। কর্মীদের অর্থাৎ শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের এই ব্যাপারে কোন অভিমত থাকতে পারে। পরিচালকবৃন্দ ও কর্মীবৃন্দের মধ্যে ভাবনা-চিন্তা ও মতামত অকপট ও খোলাখুলিভাবে আলোচনা হওয়া দরকার। আলাপ-আলোচনা করার মত একটা সুষ্ঠু পরিবেশ রচনা করতে পারলে যোগাযোগ ব্যবস্থা ফলপ্রসূ হতে পারে, অন্যথায় নয়। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই ব্যবস্থাপনা তথ্য পরিকল্পনার দোষ-ত্রুটিগুলি জানা যায় এবং সেগুলি সংশোধন করা সম্ভব।

তৃতীয় স্তরটিকে বলা হয় **নিয়ন্ত্রণ**। যখন কোন পরিকল্পনা তৈরী করা হয় তখন কার্য সম্পাদনকে সামনে রাখা হয়। পরিকল্পনার সঙ্গে কার্য সম্পাদনের যাতে একটা সঙ্গতি রক্ষিত হয় তা নিশ্চিত করাই নিয়ন্ত্রণের কাজ। যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তার সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে কর্মপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করা একান্ত প্রয়োজন। কর্মপদ্ধতিতে কোন ত্রুটি হলে বা কোন কর্মী তার কর্তব্য-কর্ম থেকে বিচ্যুত হলে সমগ্র কর্মপদ্ধতির ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়ে যায় এবং সেক্ষেত্রে ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয় না। নিয়ন্ত্রণ না থাকলে প্রত্যেকে নিজ নিজ খেয়ালখুশি মত কাজ করতে পারে। স্কুলে যদি শিক্ষকেরা নিয়মিত ক্লাস না নেন, সিলেবাস শেষ না করেন, ঠিকমত পরীক্ষা না নেন কিংবা সময়ে ফল প্রকাশ না করেন, তাহলে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য পূরণ হবে না। সেক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে এগুলি মাঝে মাঝে পর্যালোচনা করা দরকার এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করাও দরকার। সেইজন্যই বলা হয় পরিকল্পনা যত ভালই হোক না কেন উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ না থাকলে তা কখনও সফল হতে পারে না।

■ শিক্ষাগত ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষাগত প্রশাসনের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between Educational Management and Educational Administration)

আমরা জানি ব্যবস্থাপনাতে একটি পদ্ধতি নির্ণয় করতে হয় এবং তার জন্য একটি পরিকল্পনার প্রয়োজন। ঐ পদ্ধতি সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মধ্যে একটা পারস্পরিক

➢ ব্যবস্থাপনাতে ক্ষমতা ও দায়িত্বের বিকেন্দ্রীকরণ হয় বলে এর মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে, কিন্তু প্রশাসন একটি 'মাথা-ভারী' ব্যবস্থা (Top Heavy System)।

■ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা (Institutional Management) :

শিক্ষাগত ব্যবস্থাপনাকে সাধারণত দুভাগে ভাগ করা যায় — একটি হল প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা এবং অন্যটি হল সম্পদ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাপনা। যখন কোন প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার সময় ব্যবস্থাপনার কৌশলগুলি প্রয়োগ করা হয় তখন তাকে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা (Institutional Management) বলে। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। একটি বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা করা যাক। বিদ্যালয়ের কাজকর্ম পরিচালনা করতে গেলে প্রথমেই কাজকর্মগুলির লক্ষ্য স্থির করতে হবে। এইবার ঐ লক্ষ্যপূরণের জন্য কি কি কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন তা স্থির করতে হবে। আমাদের বিদ্যালয়গুলির লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদের সুপ্ত গুণাবলী ও অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলির পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করে তাদের সমাজের যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা। এর জন্য প্রথমে বিদ্যালয়ের বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী একটি পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে। এই পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়িত করার ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক নেতৃত্ব দেবেন এবং অন্যান্য শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। এরপর প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামো এবং শিক্ষকমণ্ডলীর সংখ্যা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অনুযায়ী সময় পত্রিকা রচনা করা হবে। তারপর বিদ্যালয়ের অন্যান্য কাজ, যথা — শৃঙ্খলা রক্ষা, সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী, পানীয় জল, শৌচাগার প্রভৃতি স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে।

তবে সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য একই প্রকার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা চলতে পারে না। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য ব্যবস্থাপনা একই রকমের হবে না। আবার সাধারণ বিদ্যালয় ও বিশেষধর্মী বিদ্যালয় বা প্রতিবন্ধীদের জন্য বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনাও এক প্রকার হয় না। সুতরাং বলা যায় প্রতিষ্ঠানের স্বরূপ, লক্ষ্য ও পরিকাঠামো অনুযায়ী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা ভিন্ন ভিন্ন হয়। তবে একথা বলা যায় যে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার কৌশলগুলি ব্যবহার করে আমরা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যপূরণ এবং প্রাপ্ত মানবসম্পদ ও বস্তুসম্পদের সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সাফল্য অর্জন করতে পারি।

■ শিক্ষাগত ব্যবস্থাপনার কাজ :

শিক্ষাগত ব্যবস্থাপনা হল শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্যের ভিত্তি। এর উপর ভিত্তি করে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশাসন, পরিদর্শন এবং তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। শিক্ষাগত ব্যবস্থাপনার কাজ সাধারণ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করা যায়, যথা —

● (১) পরিকল্পনা (Planning) :

শিক্ষাগত ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল পরিকল্পনা। যে কোন কাজ, সে ছোটই হোক আর বড়ই হোক কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়া তা সফল ও সার্থক করা যায়

শিক্ষার জগৎ বিশাল, প্রাক্-প্রাথমিক থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত এটি বিস্তৃত। এই বিশাল কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করার জন্য একটি উত্তম পরিকল্পনার প্রয়োজন। তাই ব্যবস্থাপনার প্রথম স্তরই হল পরিকল্পনা প্রণয়ন।

● (২) সংগঠন (Organisation) :

শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন উপাদান, কর্মী ও সম্পদের মধ্যে একটা সুষ্ঠু সংগঠন গড়ে না তুলতে পারলে শিক্ষার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে সংগঠন হল সেই যন্ত্র বা উপায়, যার সাহায্যে সব কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়। তাই ব্যবস্থাপনাতে সংগঠন কর্মটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

● (৩) নির্দেশনা (Direction) :

যেমন তেমন করে কাজ করলে লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় না। সেইজন্য ব্যবস্থাপনার কাজ কিভাবে কাজটি করতে হবে সে সম্পর্কে কর্মীদের সুষ্ঠু নির্দেশদান। নির্দেশদানের মধ্যে নেতৃত্বের ধারণাটি সৃষ্ট হয়। যে কোন একজন নেতা বা প্রধান ব্যক্তি থাকেন যার নির্দেশ মেনে অন্যান্যরা কর্ম সম্পাদন করে লক্ষ্যে উপনীত হন। নির্দেশনা সঠিকভাবে পথ নির্দেশ করে এবং সমগ্র সংগঠনটিকে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের অভিমুখে পরিচালিত করে।

● (৪) নিয়ন্ত্রণ (Control) :

যে কোন সংগঠনে বহু কর্মী একসঙ্গে কাজ করে। তবুও তাদের মধ্যে কেউ কেউ ভুল বা সঠিক পথে না গিয়ে নিজের মত করে কাজ করতে শুরু করে। এ রকম ক্ষেত্রে অন্যান্য কর্মীরা বিভ্রান্ত হয়ে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হতে পারে। সেক্ষেত্রে কর্মীদের নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন হয়। তাই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শিক্ষাগত ব্যবস্থাপনার অন্যতম প্রধান কাজ।

● (৫) সমন্বয়ন (Co-ordination) :

এটি হল সকলের প্রচেষ্টাকে এক সূত্রে গ্রথিত করার কাজ। এটি হল সংগঠনের অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তি, সম্পদ এবং তাদের কর্মপ্রচেষ্টাকে এমন এক সূত্রে বাঁধা যাতে সকলে একটি সাধারণ লক্ষ্যের দিকে তাদের প্রয়াসকে পরিচালিত করে। এরজন্য শিক্ষাগত ব্যবস্থাপনাতে প্রথমেই শ্রম বিভাজন বা কে কোন্ কাজ করবেন তা স্থির করে দেওয়া হয় এবং তারপর উপযুক্ত লোকের মধ্যে কাজ ভাগ করে দিয়ে মানব সম্পদ ও বস্তু সম্পদ নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করার ব্যবস্থা করা হয়। কর্মীদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন করাই এই সমন্বয়নের প্রধান কাজ।

● (৬) মূল্যায়ন (Evaluation) :

শিক্ষাগত ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা একটি গতিশীল পদ্ধতি। ব্যবস্থাপনা অপরিবর্তনীয় নয়। সেইজন্য কর্মের অগ্রগতি বা সাফল্যের মাত্রা মাঝে মাঝে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন যাতে দরকার হলে কোনরকম পরিবর্তন করা যায়। এক্ষেত্রে কোন ব্যর্থতা ঘটলে তার কারণটিও অনুসন্ধান করে দেখা হয়।

● (৭) লিপিবদ্ধকরণ (Recording) :

সমস্ত প্রচেষ্টার বিবরণ সংগ্রহ করা এবং তা লিপিবদ্ধ করে রাখা ব্যবস্থাপনার অন্যতম কাজ। শিক্ষা-পরিচালককে (Educational Manager) অভিভাবক, পরিদর্শক এবং শিক্ষার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য ব্যক্তিদের নিকট শিক্ষার সাফল্য বা ব্যর্থতা সম্বন্ধে অবহিত করতে হয়। তাঁর কাছে লিখিত তথ্য না থাকলে তিনি সব কিছু জানাতে পারবেন না। ফলে শিখন প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তর লিপিবদ্ধ করে রাখলে অন্যদের জানাতে যেমন সুবিধা হয় তেমনই ভবিষ্যতে যাঁরা এ জাতীয় কাজ করবেন, তাঁদেরও সুবিধা হয়। তবে বিষয় যেন সঠিকভাবে লিখিত ও রক্ষিত হয়, সে দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক।

■ শিক্ষাগত ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি (Process of Educational Management) :

স্টিফেন এলিয়টের মতে সমস্ত রকম সংগঠনের লক্ষ্য পূরণের জন্য ব্যবস্থাপনার অবশ্য প্রয়োজন। ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিকে আমরা তিনভাগে বিচার করে থাকি, যেমন — পরিকল্পনা প্রণয়ন (Planning), যোগাযোগ রক্ষা (Communication) এবং নিয়ন্ত্রণ (Control)। পরিকল্পনা প্রণয়ন করার মাধ্যমে লক্ষ্য ও কর্মপদ্ধতি স্থির করা হয়; কথাবার্তা কিংবা সংবাদ আদান-প্রদানের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করা হয় এবং নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে পরিকল্পনার সঙ্গে কর্মসম্পাদনার সঙ্গতি সাধন করা হয়। এখন এইগুলি কি পদ্ধতিতে সম্পাদিত হয়, তা আলোচনা করা যাক —

● পরিকল্পনা প্রণয়ন :

শিক্ষাগত ব্যবস্থাপনার প্রধান কাজ হল শিক্ষার সর্বনিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরী করা। তবে পরিকল্পনা রচনা করার সময় দুটি বিষয়ের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে — শিক্ষাসংক্রান্ত কাজকর্মের লক্ষ্য স্থির করা এবং ঐ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য সঠিক কর্মপদ্ধতি নির্বাচন করা। পরিকল্পনা কমিশনের মতে, নির্দিষ্ট লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সবচেয়ে ভালভাবে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের পদ্ধতিকেই পরিকল্পনা বলা হয়।

● যোগাযোগ রক্ষা :

ব্যবস্থাপনার দ্বিতীয় পদ্ধতি হল যোগাযোগ রক্ষা। এর অর্থ হল কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালকবৃন্দের সঙ্গে ঐ প্রতিষ্ঠানের সমস্ত কর্মীর মনোভাব ও তথ্যের খোলাখুলি আদান-প্রদান। এই পদ্ধতিতে সকল কর্মীর মতামতকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে পারস্পরিক বোঝাপড়ার একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। তাহলেই প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয়।

● নিয়ন্ত্রণ :

ব্যবস্থাপনার তৃতীয় পদ্ধতিটি হল নিয়ন্ত্রণ। এর অর্থ হল পরিকল্পনার সঙ্গে কর্ম সম্পাদনের ঠিকমত সঙ্গতি রক্ষিত হচ্ছে কিনা — তা দেখা এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। কোন প্রতিষ্ঠানকে সঠিকভাবে তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে নিয়ন্ত্রণের সাহায্য গ্রহণ করা উচিত।

■ শিক্ষাগত ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য (Objectives of Educational Management) ঃ

শিক্ষাগত ব্যবস্থাপনা একটি বহুমুখী প্রক্রিয়া। এটি একটি সামাজিক প্রক্রিয়া যেটি পরিচালিত করা হয় সহযোগিতা, যৌথভাবে কাজ করার অংশীদারিত্ব গ্রহণ, কাজের মধ্যে প্রবেশ করা এবং অন্য লোকের সঙ্গে মিলেমিশে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে উপনীত হওয়ার জন্যই। এটি সামাজিক প্রক্রিয়া বলেই প্রতিষ্ঠানের ভেতরে এবং বাইরে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তাছাড়া কাজ করার সময় ব্যক্তি তার উর্ধ্বতন এবং নিম্নতন ব্যক্তিদের সঙ্গেও যোগাযোগ রক্ষা করে এবং তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেয়। এইসবের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাগত ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যগুলি স্থির করা হয়। বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন সংজ্ঞার সাহায্যে শিক্ষাগত ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যগুলি প্রকাশ করা হয়েছে। সাধারণভাবে বলা যায়, শিক্ষাগত ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যগুলি এই জাতীয় —

- বিদ্যালয়ের কার্যকলাপ নির্দিষ্ট করা।
- ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা তৈরী করা এবং তা বাস্তবায়িত করার চেষ্টা।
- বিদ্যালয়ের সুপরিচালনার জন্য মানব সম্পদ ও বস্তু সম্পদের বন্দোবস্ত করা।
- শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা যাতে নিজের নিজের কর্তব্য ঠিকমত পালন করেন, সে রকম নির্দেশদান।
- বিভিন্ন কর্মীর কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা এবং তাদের কাজের মধ্যে সহ-সম্বন্ধ নির্ণয় করে সকলকে একভাবে কাজ করতে শিক্ষা দেওয়া।
- সকলের কাজ নিয়ন্ত্রণ করা এবং লক্ষ্য রাখা যেন কেউ নিয়ম-নীতির বিরুদ্ধে কোন কাজ না করেন এবং প্রত্যেকে যেন সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করেন।
- শিক্ষাক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং উন্নত মানের গবেষণার সহায়ক একটি শিক্ষা-পরিবেশ তৈরী করা।

এরপর আরও বহু শিক্ষাবিদ উদ্দেশ্যগুলি নতুনভাবে প্রকাশ করার প্রচেষ্টা করেছেন। তাঁদের মতে শিক্ষাগত ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যের মধ্যে উপরে উল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলি ছাড়াও আরও কিছু উদ্দেশ্য আছে, যেমন —

- যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা শিক্ষাক্ষেত্রে পাওয়া যেতে পারে, সেগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা।
- সংগঠন এবং ব্যবস্থাপনার পক্ষে প্রয়োজনীয় সম্পদগুলির একত্র সমাবেশ।
- শিক্ষাক্ষেত্রে ঠিকমত নির্দেশ পালিত হচ্ছে কিনা, সমন্বয়ন ঠিকমত কার্যকরী হচ্ছে কিনা এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকরী হচ্ছে কিনা — সে সব ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তদারকীর (Supervision) ব্যবস্থা করা।
- সঠিক কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য উপযুক্ত প্রেষণা সৃষ্টি করা।
- শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অন্যান্য কর্মীদের কর্মসম্পাদন, তার পরিমাপ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সঠিক মূল্যায়ন।

এক কথায় বলা যায় শিক্ষাগত ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য একমুখী নয়, বহুমুখী এবং উদ্দেশ্যগুলি হল পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রশাসন, পরিকল্পনার রূপায়ণ এবং তার সঠিক মূল্যায়ন। এগুলির মধ্যেই সংগঠন, নির্দেশদান, তত্ত্বাবধান বা তদারকী, নিয়ন্ত্রণ, সমন্বয়ন — সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে।

■ **শিক্ষাগত ব্যবস্থাপনার প্রকার বা রূপভেদ (Types of Educational Management) :**

ব্যবস্থাপনা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া বলে কোন প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা একান্ত জরুরী। এই সদস্যরা প্রতিষ্ঠানের ভেতরে বা বাইরেও থাকতে পারেন। অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত সব সদস্যের মধ্যেই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা অত্যন্ত জরুরী। তাছাড়া কোন প্রতিষ্ঠানে যিনি বিশেষ স্থান অধিকার করে থাকেন, তাঁর উপরের এবং নীচের কর্মীদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করাও প্রয়োজন। ব্যবস্থাপনা বলতে একটি সাধারণ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য একটি বিশেষ দলের ক্রিয়াকলাপকে বাঞ্ছিত পথে পরিচালিত করাকে বোঝায়। এর প্রকৃতি হচ্ছে 'অংশগ্রহণ করা'। ব্যবস্থাপনাতে ছোট থেকে বড় — যিনি যে পদেই থাকুন না কেন, প্রত্যেককে কাজে অংশগ্রহণ করতেই হবে। ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য হল মানব সম্পদ অর্থাৎ ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ গুণাবলীর পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করা।

এই সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থাপনাকে দুটি শ্রেণীর অন্তর্গত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। শ্রেণী দুটিকে আমরা Type A (ক) এবং Type B (খ) এই দু-ভাগে ভাগ করে থাকি।

'A' বা 'ক' বিভাগের আবার দুটি ভাগ, যথা —

(১) কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাপনা (Centralisation of Management)

(২) বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাপনা (De-centralisation of Management)

'B' বা 'খ' বিভাগের ভাগগুলি হল —

(১) একতান্ত্রিক বা স্বৈরাচারী ব্যবস্থাপনা (Autocratic Management)

(২) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা (Democratic Management)

(৩) অবাধ বা হস্তক্ষেপবিহীন ব্যবস্থাপনা (Laissezfaire Management)

এছাড়া আরও দু-ধরনের ব্যবস্থাপনার কথা বলা হয়ে থাকে, যেমন —

(১) কর্তৃত্বসুলভ ব্যবস্থাপনা (Authoritarian Management) এবং

(২) গতিশীল ব্যবস্থাপনা (Dynamic Management)

এবার এগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক —

● **(১) কেন্দ্রীভূত বা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা (Centralisation of Management) :**

কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে শক্তি বা কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা শীর্ষে অর্থাৎ ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রে অবস্থিত থাকে এবং সেখান থেকে ক্ষমতা ক্রমে ক্রমে নিম্নতর স্তরগুলিতে ছড়িয়ে

দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে মূল চালিকা শক্তি হল কেন্দ্র। কেন্দ্র যেভাবে নির্দেশ দেবে, অধস্তন বিভাগগুলি বা কর্মীরা সেইভাবে কাজ করে যাবে। এই পদ্ধতিতে কর্মীদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ যেমন বজায় রাখা যায়, তেমনই নিয়ম-কানুন, চাকুরীর শর্ত, কার্যনির্বাহ করার পদ্ধতি — সবের মধ্যে একটা ঐক্য ও সমতা বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়। এতে কাজে সাফল্য আসা নিশ্চিত হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, এইভাবে ক্ষমতা সঞ্চালিত করার জন্য অধস্তন বিভাগগুলির যদি কোন সম্পদ বা সহায়তার প্রয়োজন হয়, তা কেন্দ্রীয় সংস্থা থেকে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে। ফলে কাজের প্রসার, স্থায়িত্ব ও গবেষণামূলক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া সম্ভব। কিন্তু এত ভাল দিক থাকলেও বিভিন্ন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করা ও তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার ক্ষেত্রে নানা প্রকার সমস্যা দেখা দিতে পারে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই জাতীয় ব্যবস্থাপনার একটি বড় ত্রুটি হল — এই ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র থেকে ক্রমশ নীচের দিকে আঞ্চলিক স্তরে নেমে আসে। কেন্দ্র ও অঞ্চলের মধ্যে দূরত্ব অনেক এবং তার ফলে কেন্দ্র আঞ্চলিক অসুবিধা বা সমস্যাগুলি সম্বন্ধে সম্যকভাবে অবহিত নাও থাকতে পারে। ফলে স্থানীয় বা আঞ্চলিক সমস্যাগুলির সমাধান প্রায়শই হয়ে ওঠে না।

● (২) বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাপনা (De-centralisation of Management) :

এটি কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ বিপরীত একটি পদ্ধতি। এই জাতীয় ব্যবস্থাপনা ক্ষমতাকে বিশেষ একটি স্থানে কেন্দ্রীভূত না রেখে বিভিন্ন স্থানে বা বিভিন্ন লোকের মধ্যে ক্ষমতাটি বণ্টন করে দেয়। এর ফলে দায়িত্বটিও একজনের উপর না থেকে অনেকের মধ্যে বণ্টিত হয়ে থাকে। এতে সকলের পক্ষে দায়িত্ব পালন করা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। যে কোন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিই বিকেন্দ্রীকরণকে সমর্থন করে। যেমন ধরা যাক ভারতবর্ষের প্রশাসন। এই প্রশাসনের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, আঞ্চলিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা, জেলা স্তর, মহকুমা স্তর, গ্রামীণ স্তর প্রভৃতির মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ঠিক তেমনই শিক্ষাক্ষেত্রেও শিক্ষামন্ত্রক থেকে শুরু করে একেবারে স্কুল পরিচালন সমিতি পর্যন্ত ক্ষমতা বণ্টিত হয়। একটি স্কুলে প্রধান শিক্ষক তাঁর সহশিক্ষকবৃন্দ, শিক্ষাকর্মী, পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ, স্টাফ কাউন্সিল, অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল প্রভৃতির মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করে দেন। এতে সকলের সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করা সম্ভব। এর সুবিধা হল যে কোন স্তরে কোন অসুবিধা থাকলে তা সর্বোচ্চ স্তরে জানানো সম্ভব, বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের একটি কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা বা দায়িত্বের অংশীদার হওয়া, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং সমস্যার দ্রুত সমাধান করা সম্ভব। এই জাতীয় ব্যবস্থাপনাই শিক্ষাক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয়।

➤ **সিদ্ধান্ত** : কেন্দ্রীভূত এবং বিকেন্দ্রীভূত দু-ধরনের ব্যবস্থাপনারই ভাল এবং মন্দ উভয় দিকই আছে। কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাপনা ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণে (Power over) বিশ্বাসী এবং আদেশ দিয়ে, নিয়ন্ত্রণ করে অন্যদের দিয়ে দায়িত্ব পালন করাতে চায়। সেক্ষেত্রে ইচ্ছা না থাকলেও দায়িত্ব পালন করতে হয় বলে কোন কোন ক্ষেত্রে ফাঁক থেকে যায়। কিন্তু বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাপনাতে দায়িত্ব সকলের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয় (Power

with) বলে সকলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দায়িত্ব পালনে এগিয়ে যায়। ফলে কাজটি আন্তরিকভাবে সম্পন্ন হয় এবং ফাঁকির পরিমাণ খুব কম হয়।

● **(৩) একতান্ত্রিক বা স্বৈরাচারী ব্যবস্থাপনা (Autocratic Management)।**

কোন দেশে একনায়কতন্ত্র থাকলে যেমন শাসক স্বৈরাচারী হয়ে যান, তেমনই শিক্ষায়তন ব্যবস্থাপনাতে যদি একনায়কতন্ত্র থাকে, তাহলে সর্বোচ্চ পদে যিনি থাকেন, তিনি সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হয়ে স্বেচ্ছাচার করতে পারেন। যেমন — একজন প্রধান শিক্ষক যদি অন্যান্য শিক্ষকদের সহযোগিতা গ্রহণ না করেন বা কোন প্রকার আলোচনা না করে নিজের খুশীমত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে থাকেন, তাহলে অন্য শিক্ষকবৃন্দ অপমানিত ও অবহেলিত বোধ করবেন। শিক্ষকেরা তাঁদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং দক্ষতা বা ক্ষমতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন। যেমন — রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় যদি রাজ্য সর্বময় কর্তৃত্ব কুক্ষিগত করে জনগণকে অবজ্ঞা করে, তাহলে জনগণ রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে চলে যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে কোন প্রকার সাফল্য আসতে পারে না। বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা এ জাতীয় হলে পাঠ্যক্রম শেষ হয় না, পরীক্ষা ব্যবস্থায় গণ্ডগোল দেখা দেয় এবং বিদ্যালয় প্রশাসনেও ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনাতে সহযোগিতা লাভ করাটাই হচ্ছে মূল কথা। কিন্তু একতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনাতে সহযোগিতাকে দূরে রাখা হয়। **একতান্ত্রিক বা একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, যেমন –**

➢ এই জাতীয় ব্যবস্থাপনায় একজন প্রশাসক সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন বলে পরিকল্পনা তিনি একাই করেন, বা তিনি তাঁর পছন্দমত কয়েকজন ব্যক্তি মনোনীত করে তাঁদের উপর পরিকল্পনা তৈরী করার দায়িত্ব দেন।

➢ তিনি কর্মীদের বা তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের নির্দেশ দেন কি করতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশাসক এই জাতীয় হলে তিনি শিক্ষকদের ছাত্র বা অভিভাবকদের সামনে বিব্রত করতে পারেন।

➢ কাজের পুরো কৃতিত্ব তিনি একাই দাবী করেন কিন্তু ব্যর্থতার দায়ভার অন্যের উপর চাপিয়ে দেন।

➢ তিনি অধীনস্থ কর্মচারীদের দক্ষতা বা নেতৃত্ব দান করার ক্ষমতা স্বীকার করতে চান না।

➢ তিনি কাউকে কিভাবে কাজ করতে হবে সে সম্বন্ধে কোন উপায় না বলে কেবল 'নিজে নিজে করুন' — এই নীতি প্রয়োগ করেন। অর্থাৎ তিনি কাউকে সাহায্য করেন না এবং কারও সহায়তা বা সহযোগিতা গ্রহণ করেন না।

➢ তাঁর কাজে অন্যান্য কর্মচারীরা ভীতি বোধ করে বলে কাজের মান খারাপ হতে পারে।

➢ কে কোন্ কাজের যোগ্য — তা বিচার না করে তিনি খুশীমত দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং অত্যন্ত কড়া ভাষায় ও কঠোরভাবে নির্দেশদান করেন।

➢ এমন প্রশাসককে কর্মীরা পছন্দ করে না।

(৪) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা (Democratic Management) :

এই পদ্ধতি একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ বিপরীত একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ক্ষমতা বা দায়িত্ব কোন বিশেষ ব্যক্তির উপর অর্পণ না করে সকলের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করে দেওয়া হয়। প্রশাসক অন্যান্য কর্মীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে সম্মান ও যথাযথ মূল্য প্রদান করেন এবং তাঁদের দেওয়া নীতি ও আদর্শ গ্রহণযোগ্য মনে হলে তা গ্রহণ করে নিতে দ্বিধাবোধ করেন না। আমাদের বিদ্যালয়ে এই রকম প্রশাসনের প্রয়োজন যেখানে প্রধান শিক্ষক অন্যান্য সহশিক্ষকদের সহযোগিতায়, তাঁদের সঙ্গে মত বিনিময়ের মাধ্যমে একটা বন্ধুত্বসুলভ পরিবেশে শিক্ষার লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করবেন।

এই জাতীয় ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্যগুলি হল —

➤ **(ক) দায়িত্ব বিভাজনের নীতি :** জন ডিউই-এর মতে গণতন্ত্রের অর্থ হল অভিজ্ঞতার অংশীদারিত্ব। বিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার প্রচলন করতে হলে বিদ্যালয়ের প্রধানকে শিক্ষক, ছাত্র, শিক্ষাকর্মী প্রমুখ সকলের মধ্যে ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কাজের ভার ভাগ করে দিতে হবে। প্রধানকে সকলের বন্ধু, দার্শনিক এবং পথ প্রদর্শক হিসাবে কাজ করতে হবে। এর ফলে প্রধান শিক্ষকের কাজের চাপ অনেকটা হাল্কা হয়ে যায় এবং তিনি বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য পরিকল্পনা করার যথেষ্ট সময় পেয়ে যান।

➤ **(খ) সমতার নীতি :** গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় কে ছোট আর কে বড় তা বিচার করা হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তির দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে সমান মনে করে প্রত্যেকের মতামতকে গুরুত্ব সহকারে বিচার করা হয়। ফলে বিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যবস্থাটি একটি যৌথ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

➤ **(গ) স্বাধীনতার নীতি :** এই পদ্ধতিতে প্রত্যেক কর্মীকে তার ক্ষমতা ও প্রতিভা প্রদর্শন করার পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় ব্যক্তি স্বাধীনভাবে চিন্তা করার, কাজ করার, আবিষ্কার করার এবং নতুন কিছু সৃষ্টি করার সুযোগ পান। প্রধান শিক্ষক সেগুলির স্বীকৃতি দেন বলে একটা হৃদ্য পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এটি বিদ্যালয়ের পক্ষে অত্যন্ত শুভকর।

➤ **(ঘ) নেতৃত্ব দান করার নীতি :** গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্ব দান করার ক্ষমতাটিও একজনের কুক্ষিগত থাকে না। সাধারণত বিদ্যালয়ের কাজে প্রধান শিক্ষকই নেতৃত্ব দান করেন। কিন্তু তার কোন অসুবিধা থাকলে বা তিনি কোন ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করলে কোন যোগ্য শিক্ষকের নেতৃত্বদান করা উচিত। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় প্রধান শিক্ষক নতুন দায়িত্ব নিয়ে যিনি আসেন, তাকে স্বাগত জানান।

➤ **(ঙ) ন্যায়ের নীতি :** গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় সকলকে সমানভাবে বিচার করা হয়। এখানে কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব বা বিশেষ পছন্দের ব্যক্তি বলে কিছু থাকে না। প্রধান

শিক্ষক ন্যায়সঙ্গতভাবে সকলের প্রতি পক্ষপাতশূন্য মনোভাব দেখান। এইভাবে ন্যায়ের নীতি অবলম্বন করেই বিদ্যালয়ের যাবতীয় সমস্যা সমাধান করা সম্ভব।

➤ (চ) স্বীকৃতির নীতি : গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় প্রত্যেক ব্যক্তির দক্ষতা, অভিজ্ঞতা বা কৃতিত্বকে যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। প্রশংসা, বাহবা দান বা পুরস্কার দানের মাধ্যমে এই স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ W. M. Ryburn-এর একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য — "Nothing will more encourage a man or a woman, a boy or a girl to a greater effort, than an encouraging recognition of good work done, of sincere effort made, of good qualities shown." সুতরাং প্রশাসনের মাথায় যিনি আছেন তাঁর উচিত কর্মীদের যোগ্যতা ও দক্ষতার যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান।

➤ (ছ) সহযোগিতার নীতি : গণতান্ত্রিক পদ্ধতিই একমাত্র পদ্ধতি যেখানে সকলে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। ব্যবস্থাপনার শীর্ষে যিনি থাকেন, তিনি প্রয়োজন হলেই প্রত্যেকের সহযোগিতা চাইবেন এবং সকলে তার সঙ্গে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসবে। সমস্ত কর্মী নিজেদের একই পরিবারের সদস্য মনে করে একে অন্যকে সাহায্য করার জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাত বাড়িয়ে দেয়।

➤ (জ) নমনীয়তার নীতি : গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় শীর্ষ প্রশাসকের মনোভাব দৃঢ়, অনমনীয় বা অপরিবর্তনীয় না হয়ে পরিবর্তনশীল বা নমনীয় হয়। বিদ্যালয়ের স্বার্থে বা শিক্ষার্থীদের কোন সমস্যার সমাধানে প্রধান শিক্ষককে অনেক সময় নরম মনোভাব গ্রহণ করতে হয়। তা না হলে একটা অচলাবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। সেইজন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় নমনীয়তার নীতি গ্রহণ করা হয়।

➤ (ঝ) সহকর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগের নীতি : একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান যত বৃদ্ধি পাবে, শিক্ষার্থীরা তত বেশি লাভবান হবে। সেইজন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় শিক্ষকদের শিক্ষাগত, পেশাগত বা অন্যান্য যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়। শিক্ষণ-শিখনের উৎকর্ষ সাধনের জন্য শিক্ষকদের কর্মরত অবস্থায় প্রশিক্ষণে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। এতে শিক্ষকদের গুণগত উৎকর্ষ সাধিত হয়।

এইভাবে শিক্ষাগত ব্যবস্থাপনা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে যদি চলতে থাকে তাহলে শিক্ষার্থীরাও উপকৃত হবে এবং তারা তাদের বিদ্যালয়ের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক জীবনধারা সম্বন্ধে একটা ধারণা সৃষ্টি করে নিতে সক্ষম হবে।

● (৫) অবাধ বা হস্তক্ষেপবিহীন ব্যবস্থাপনা (Laissezfaire Management) :

এটি এক ধরনের বিচিত্র ব্যবস্থাপনা যেখানে প্রত্যেকের অংশীদারিত্ব আছে, কিন্তু কোন নেতৃত্ব বা কর্তৃত্ব নেই। এই জাতীয় ব্যবস্থাপনায় কোন উপযুক্ত বা বিশ্বাসযোগ্য নেতা থাকেন না। কর্মীরা নিজেরাই সবরকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং নিজের নিজের

...জানিয়ে দেয়। নেতার উপস্থিতিতে এই মত জানানো হলেও নেতা একজন নিষ্ক্রিয় দর্শক হিসাবে যেন সেখানে উপস্থিত থাকেন। তাঁর সমর্থন করার বা প্রতিবাদ করার ...ক্ষমতা থাকে না। নেতা তাঁর নিজস্ব মতামত দিয়ে কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করার পরিবর্তে কর্মীদের মতের দ্বারা তিনি নিজেই প্রভাবিত হয়ে পড়েন। এই পদ্ধতিতে কর্মীরা উপলব্ধি করে যে তাঁরা তাঁদের সিদ্ধান্ত নেতার নিকট থেকে গ্রহণ করছে না, করছে পরিস্থিতির ...বা প্রয়োজন অনুযায়ী। এতে প্রত্যেক কর্মীর ক্ষমতা যেন অন্যের তুলনায় বেশি। ...কোন কর্মী যখন কোন সিদ্ধান্ত এককভাবে গ্রহণ করে, তখন অন্য কারও সিদ্ধান্ত ...হতে পারে তা চিন্তা করে না, তাঁর নিজের সিদ্ধান্তকেই চরম সিদ্ধান্ত বলে মনে করে ...। পরিচালকেরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করলেও সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করা উচিত না ...উচিত, বা সবচেয়ে ভাল সিদ্ধান্ত কি হতে পারে, সে বিষয়ে কোন মতামত জ্ঞাপন করেন না। বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষে কোন সমস্যা সৃষ্ট হলে শিক্ষকেরা নিজেরাই তার সমাধানের ...খুঁজে বের করেন, অনেক সময় প্রধান শিক্ষককে না জানিয়েই। এই জাতীয় ব্যবস্থাপনায় ...কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করেন না বলে এই জাতীয় ব্যবস্থাপনায় ভুল-ত্রুটি বা বিশৃঙ্খলা ঘটার সুযোগ বেশি।

● (৬) কর্তৃত্বমূলক ব্যবস্থাপনা (Authoritarian Management) :

এটি একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার নামান্তর মাত্র। কোন প্রতিষ্ঠানে প্রধান, যেমন — স্কুল বা কলেজের প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষ যখন নিজেকে প্রতিষ্ঠানের কর্তা বা প্রধান হিসাবে সহকর্মীদের তাঁর নির্দেশ বা মতামত পালন বা অনুসরণ করতে বাধ্য করেন, তখন সেই জাতীয় ব্যবস্থাকে বলে কর্তৃত্বমূলক ব্যবস্থাপনা। এখানে অন্যান্যদের মতামতের কোন মূল্য বা গুরুত্ব দেওয়া হয় না। 'কর্তাই প্রধান, অন্যান্যরা অপ্রধান' — এই চিন্তা কাজের পরিবেশ নষ্ট করে দিতে পারে। এর অন্যান্য দিকগুলি একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার অনুরূপ। কর্তৃত্ব খুব যোগ্য ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হলেও এবং তাঁর সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন হলেও, সহকর্মীদের অবজ্ঞা বা অবহেলা করা কর্ম-সংস্কৃতির বিরোধী।

● (৭) গতিশীল ব্যবস্থাপনা (Dynamic Management) :

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনাকে গতিশীল ব্যবস্থাপনা বলা যায়। যখন কোন পদ্ধতি কর্মীদের ...উৎসাহ সঞ্চার করে, অনুপ্রেরণা দেয়, তখন কর্মীদেরও বেশি করে কাজ করার ...এবং ভাল করে কাজ করার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কাজের মধ্যে একটা ...সঞ্চারিত হয়। এই ব্যবস্থাপনার মূল কথা হচ্ছে কর্মীদের মধ্যে প্রেষণা জাগ্রত করা। ...সময় কথাবার্তা বলার মাধ্যমে তাদের মধ্যে প্রেষণা সঞ্চার করা সম্ভব (Vocal ...), আবার অনেক সময় কিছু বাইরের উদ্দীপক বা উদ্বোধকের (Incentive) প্রয়োজন ...। পুরস্কার বা সার্টিফিকেট প্রদান, মেডেল দিয়ে কৃতিত্বের স্বীকৃতি বা কলকারখানাতে ...উন্নতি দানের মাধ্যমে কাজে গতি সঞ্চার করার সহায়ক প্রেষণা সৃষ্টি করা হয়। ...বাহ্যিক উদ্বোধকের তুলনায় মানসিক বা আভ্যন্তরীণ উদ্বোধক অধিকতর শক্তিশালী

ও দীর্ঘস্থায়ী। গতিশীল ব্যবস্থাপনা এমন হওয়া উচিত যাতে সকল কর্মী একস্বরে বলতে পারেন — "আমরা কাজ করি কারণ কাজে আমাদের আগ্রহ আছে, আমরা কাজ ভালবাসি।"

■ শিক্ষাগত ব্যবস্থাপনার তাৎপর্য (Significance of Educational Management) ঃ

শিক্ষাগত ব্যবস্থাপনার তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর। প্রকৃতপক্ষে সঠিক ব্যবস্থাপনার উপরই শিক্ষার সাফল্য নির্ভর করে। শিক্ষার সাহায্যে আমরা শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন জাতীয় অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সাহায্য করি। এই অভিজ্ঞতাগুলি থেকে জ্ঞান, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গী, দক্ষতা প্রভৃতি অর্জিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা সমাজের যোগ্য নাগরিক হিসাবে নিজেদের প্রমাণ করে। কিন্তু এই সমস্ত কাজের মূলে থাকে সঠিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং এই প্রশাসনিক ব্যবস্থার মূলে আছে শিক্ষাগত ব্যবস্থাপনা। শিক্ষাগত ব্যবস্থাপনা না থাকলে শিক্ষাগত পরিকল্পনা তৈরী করা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ শিক্ষার প্রশাসনের ভিত্তিই হল শিক্ষাগত ব্যবস্থাপনা। শিক্ষাগত ব্যবস্থাপনার সহায়তায় আমরা শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাবার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারি। আবার শিক্ষাগত ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকলে, বা তার নীতি, তত্ত্ব, পদ্ধতি প্রভৃতি সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান না থাকলে শিক্ষাগত ব্যবস্থাপনাকে কাজে লাগানো যায় না। সেইজন্য প্রত্যেক শিক্ষাব্যবস্থায় একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষাগত ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। কোন্ পরিস্থিতিতে কি রকম ব্যবস্থাপনা চালু করলে শিক্ষাদান কার্য সহজ হবে, অধিকতর কার্যকরী হবে এবং অধিক উৎপাদনশীল (Productive) হবে — তা জানতে হবে। যারা শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশাসক বা পরিচালক হবেন, তাঁদের শিক্ষাগত ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। শিক্ষাগত ব্যবস্থাপনাই শিক্ষাক্ষেত্রে বস্তু সম্পদ ও মানব সম্পদের সঠিক ব্যবহারবিধি সম্পর্কে শিক্ষা দিতে পারে।

শিক্ষাগত ব্যবস্থাপনা একটি বহুমুখী ব্যবস্থাপনা। এর তাৎপর্য বুঝতে হলে শিক্ষার বিভিন্ন দিকে এর প্রভাব বিচার করে দেখতে হবে। এটি প্রধানত একটি সামাজিক প্রক্রিয়া এবং এর প্রধান বিচার্য বিষয় হল মানুষে মানুষে পারস্পরিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া। শিক্ষাগত ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের ভিতরে এবং বাইরে বিভিন্ন মানুষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করে এবং তার মূল্যায়ন করে। শিক্ষাগত ব্যবস্থাপনা শিক্ষা শুরু হওয়ার পূর্বেই ফল সম্বন্ধে চিন্তা করে রাখে, শিক্ষার শেষে কি হল তা চিন্তা করে না — তবে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে পর্যালোচনা করে ত্রুটি কোথায় তা নির্ণয় করার চেষ্টা করে। যাইহোক, শিক্ষাগত ব্যবস্থাপনার তাৎপর্যের দিকগুলি বিচার করলে কয়েকটি বিষয় আমাদের সামনে উপস্থিত হয়, যেমন —

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিভাবে চলবে বা তার কাজ কি হবে — তা স্থির করা।
- শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করা এবং বর্তমানকে প্রয়োজন মত সাজানো।
- মানব সম্পদ এবং বস্তু সম্পদকে সুসংগঠিত করে কাজে লাগানো।
- প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত সকলের প্রতি যথাযথ নির্দেশদান।